মিতুল-কে

দিদি

॥ ১ ॥

আজ সন্ধ্যায় হিমাদ্রিশেখরের সত্তর বছরের জন্মদিন পালন করা হবে। সর্দারশংকর রোডের এ বাড়িটা কিছু অন্য রকম। হিমাদ্রিশেখর আছেন, তাঁর স্ত্রী হেমকায়া আছেন। এ শহরে ওঁদের মেয়ে-জামাই নাতনিও থাকে।

জন্মদিনটা হিমাদ্রিরই হয়।

খুব অন্যরকম বাড়ি একটা। এত বছর এ পাড়ায় বসবাস, কিন্তু পাড়াপড়শির সঙ্গে আসা-যাওয়া নেই। পাড়ার এ দিকটা তো এমন নয় যে অনেক হাইরাইজ উঠেছে। ভূগোল পালটে গেছে পাড়ার। এখনো সুধন্য মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, কমলা ফার্মেসী আছে। সরিৎবাবুর বাড়ির নিচে ওঁর মেয়ে জামাই কি একটা ভি. ডি. ও. ছবির দোকান করেছে, আর বেলী মাসিমার অনেক গর্বের যৌথ পরিবার ভেঙে চুরে অনেকগুলো একক পরিবারে ভাগ হয়ে গেছে।

পাড়াপড়শি বলতে যা বোঝায়, সবই আছে। কিন্তু হিমাদ্রিশেখর কোনদিন তাঁর পাড়াপড়শিকে মেলামেশার সমকক্ষ মানুষ বলে মনে করেন নি। এটাকে দোষ বা গুণ বলা যাবে না। ব্যাপারটা হিমাদ্রির বংশগত। ওঁদের রক্ত না কি নীল রক্ত। ওঁদের কোনো পূর্বপুরুষ না কি মোগলদের কাছে রায়রায়ান খেতাব পেয়েছিলেন। হিমাদ্রির পিতামহীও ছিলেন কোন রায়বাহাদুরের মেয়ে।

হিমাদ্রি ছোটবেলা থেকে দেখেছেন,—ঠাকুমা পাড়াপড়শি সম্পর্কে বলতেন, ওরা মেশার যুগ্যি নয়।

মা চিরকাল বলেছেন, সমানে সমানে মেলামেশা হয়। বংশগৌরবটি মনে রেখো।

হিমাদ্রি যখন এ বাড়ি করেন, তাঁর প্রথমা স্ত্রী তখন জীবিত। তার আবার নামও প্রথমা। প্রথমাকে তার বাপের বাড়ি ও শ্বশুর-বাড়িতে একটা কথাই শেখানো হয়েছিল, স্বামী যেমন রাখবে, তেমন থাকবে।

প্রথমা কারো সঙ্গে আলাপ করতে যায় নি, পাড়াপড়শিও তার অহংকার দেখে নিন্দে করেছে। কেউ বলেছে, ভদ্রলোক অত্যন্ত নাক উঁচু মানুষ। কেউ বলেছে, বউটা দেমাকী।

এখন সবাই জেনে গেছে, এ বাড়ি অসম্ভব নিয়মে বাঁধা অন্য রকম বাড়ি। একদা ছেলে মেয়ে ছোট ছিল, জন্মদিনের ঘটাপটা হয় নি। শুধু একদিন এ বাড়িতে আলো জ্বলে, লোকজন আসে, যেদিন গৃহ-কর্তার জন্মদিন পালিত হয়।

অবশ্য হিমাদ্রি জানেন, ব্যাপারটা শুরু করে প্রথমা। বিয়ের পর ওঁরা যখন মালদায় যান,—অন্যান্য সরকারী অফিসারদের জন্মদিনে নেমন্তন্ন পেতেন।

প্রথমা বলল, আমরা যাই আর খেয়ে আসি। ওঁদের একবার ডাকাটা তো কর্তব্য।

—কি উপলক্ষ্যে ডাকবে ?

—কেন, তোমার জন্মদিনে!

এমনি করেই জন্মদিন পালন শুরু হয়। সেই যে শুরু হয়, সেটা এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। হিমাদ্রি নিজেই হইচই লাগিয়ে দেন, মনে আছে তো ?

মনে রাখে সকলেই।

হিমাদ্রির জন্মদিনে দুপুরে বাড়ির লোকজন খায় গোবিন্দভোগ চালের ভাত, সোনামুগের ডাল, পোস্তর বড়া, মোচাঘণ্ট, তেলকই আর জলপাইয়ের চাটনি।

রাতে হালকা ফ্রায়েড রাইস, রাধাবল্লভী, চিকেন গোয়ানিজ, দই-মাছ, জলপাইয়ের চাটনি, পাতলা হাতরুটি আর ছানার পায়েস।

একদা এই তালিকা চালু হয়েছিল, আজও চলছে। প্রথমা প্রথমবার এই সবই রেঁধেছিল তো!

হেমকায়া বলেছিলেন, প্রথমার জন্মদিন হত ?

—না না, কে করবে ?

—তোমার জন্মদিন তার উদ্যোগে হত, তুমিও তো ওর জন্মদিনটা পালন করতে পারতে !

হিমাদ্রি বলেছিলেন, সে তো আমি ছাড়া কারো কথা ভাবত না। এই ধরো না, রণো প্রথম সন্তান, তায় ছেলে। এক বছরের জন্মদিনে প্রথমা বলল, দরকার কি ?

সবাই তো অবাক। প্রথম সন্তান, তার ছেলে! তার একটা জন্মদিন হবে না ?

প্রথমা ঘাড় নাড়ল। হিমাদ্রির বাড়ি, বা প্রথমার বাড়ি, কোথাও কেউ জীবনে দেখেন নি যে প্রথমা তার নিজের মত জাহির করছে।

প্রথমা বলল, দরকার কি ? ওইটুকু ছেলের তো আনন্দ হবে না। বড়দের আনন্দ হবে। আমি ঘটাপটা চাই না। জন্মদিনটা পালন করা ? সে হয়ে যাবে। এই তো অন্নপ্রাশনে অনেক উৎসব হ'ল।

রণজয়ের জন্মদিন মানে পায়েস রান্না, একটা নতুন জামাপ্যাণ্ট।

প্রথমার মৃত্যুর পর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়।

দূর্বার জন্মদিন করার কথাই ভাবে নি কেউ। যে মেয়ে জন্মাবার ক'দিন বাদে মা মরে যায়, সে মেয়ে তো অলক্ষণা, রাক্ষসী। তার জন্মদিন কে করে ?

হিমাদ্রির কথা আলাদা।

সত্তর বছরের জন্মদিন, সে কি সোজা কথা ?

কয়েকদিন ধরেই হিমাদ্রি চাইছিলেন, এবারকার জন্মদিনের কথা হেমকায়া বলুন।

হেমকায়াকে দেখে মনেই হল না, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা তাঁর মনে আছে।

শেষে হিমাদ্রি বললেন, কালকে তো····

—হ্যাঁ, তোমার জন্মদিন!

—তোমার মনে আছে তা হ'লে?

—তা কেন থাকবে না!

—কই, কিছু তো বলছ না!

—কি বলব, বলো?

—সত্তর বছর পার করে দেয়া চারটিখানি কথা নয়।

—এখন তো মানুষ একশো বছরও বাঁচে।

—না না, অথর্ব অসহায় হয়ে অতদিন····

—না, তুমি তো শরীর রাখতে জানো।

—কাল মনে করি, জনা তিরিশ হবে।

—তিরিশ!

—কেন, তা জানতে চাইলে না?

—চাওয়ার কথা তো ছিল না।

হিমাদ্রির মনে হ'ল, বিয়ের আগেকার শর্ত হেমকায়া এমন করে না মানলেও পারতেন।

কিন্তু মনটাও তো খুঁতখুঁত করছে। সকালের কাগজে দেবাংশুর খবরটা পড়ে মনে ঘা লাগে খুব। দেবাংশু মারা গেল? ক্যানসারে মারা গেল? এক ব্যাচের অফিসার ছিলেন, যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল দু'জনের। দেবাংশুর শখ ছিল সেতার বাজানো,—অভ্যাসটা রেখেও ছিলেন। সঙ্গীত সম্মেলনে যেতেন সব সময়ে।

রাতে পাশাপাশি শুয়ে বলেই ফেললেন কথাটা।

—দেবাংশুর খবরটা দেখে···

—দেখলাম কালকে।

—মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। সত্যি! জীবন কি অনিত্য!

ভাবলাম এবার একটু বন্ধুবান্ধবকে ডাকি।

—ভালই করেছ।

—জানতামও না যে ওর ক্যানসার হয়েছে।

—ক্যানসার তো! এ তো অন্য অসুখ নয়।

—সে জন্যেই আমি শরীরের কথা এত ভাবি।

—ও সব কথা আর ভেবো না।

—জন্মদিনে সকালে ফোন ওই করত।

—ঘুমোও, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

—ঘুম আজকে আসবে না হেম!

অথচ হিমাদ্রি ঠিক ঘুমিয়ে পড়েন। হেমকায়ার আঙুলগুলো চলতে থাকে, চলতে থাকে।

হেমকায়া বিছানা থেকে উঠে যান।

মিলু তার ঘরে বিছানায় বসেছিল চিবুকটা হাঁটুতে রেখে। ভয়ে লজ্জায় মুখটা শুকিয়ে গেছে। চোখে এক সমুদ্র ভাবনা। ভেবে ভেবে চোখের নিচে কালি পড়েছে।

হেমকায়া ওর মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, ভেবে ভেবে শরীরটা কত খারাপ করবি মিলু?

—কাল কি হবে জানি না!

—কি আবার হবে? তোকে লতু মাসির কাছে নিয়ে যাব। কেউ জানবেও না বাড়িতে।

—জানাজানি হলে তোমাদের মুখ পুড়বে।

—মুখ পুড়বে না মিলু।

—জানাজানি হলে····

—কেউ তো জানে না আমি ছাড়া।

—কাকে বলব? মা তো আগেই চেঁচাতে শুরু করবে। মা এমন করে।

—অনেক সয়েছে তো ! ধৈর্য রাখতে পারে না।

—আমার যে কি হ'ল মাসিমা !

—মিনু ! বারবার বলেছি না, যে তোর সব দায়দায়িত্ব আমার ! হলে কি হবে, একটা ছেলে, বা মেয়ে !

—ওর বাপ মানবে না।

—আমি তো মানব। তোর কোন কষ্ট হবে না।

—দাদা, দিদি, মেসোমশাই !

—দরকার হয়, তোকে নিয়ে চলে যাব কোথাও।

—তা কি হয় না কি !

—যা হয় করব মিনু। তোর দায়িত্ব এখন আমার। আমি যা বলব, তাই করবি, কথা দিয়েছিস।

—তাই করব মাসিমা।

—কোন রকম আজেবাজে চিন্তা করবি না।

—না, আর না।

—আত্মহত্যার কথাও ভাবিস না।

—না, কখ্খনো ভাবব না।

—কাল অনেক কাজ আছে মিনু। আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ো।

—হ্যাঁ, শুয়ে পড়ছি।

মাথার নিচে ঠাকুরের ছবি রাখল মিনু। খুব গভীর বিশ্বাস ওর। বিষ্যুৎবারে লক্ষ্মীপুজো করবে, শনিবার যাবে লেক কালী-বাড়ি।

ওর বিশ্বাস যেন ওকে মনে জোর দেয়। কাল হিমাদ্রির জন্মদিন, আর হেমকায়ার অগ্নিপরীক্ষা।

সকালে কিছুই বোঝা যায়নি।

ছটা পনেরোতে হিমাদ্রিশেখর হাঁটতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সত্তরেও যুবকঈর্ষিত স্বাস্থ্য এবং শরীর। ঘড়ি ধরে একঘণ্টা লেকটা

চক্কর মেরেছিলেন। একেবারে নিয়ম মেনে হাঁটেন। হাঁটার মত ভাল ব্যায়াম কি আছে ?

অমিয় এবং মহীতোষ পাশাপাশি বসেছিলেন। অমিয় স্বাস্থ্যের-শরীরের—ডাক্তারের—বউয়ের, বা দূরদর্শনের শাসন-বারণ মানেন না। তিনি সর্বত্র নেমন্তন্ন খান। যথেষ্ট সিগারেট ফোঁকেন। বলেন, আমার তো একশো বছর বাঁচার দরকার নেই। মহীতোষও মোটামুটি নিশ্চিন্ত মানুষ। তিনি অনেক রত্ন ধারণ করে নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছেন।

হিমাদ্রি বসলেন না। বললেন, যাচ্ছ তো ?

—অবশ্যই, অবশ্যই। স্ত্রী রত্ন বটে তোমার কাজের মেয়েটি। মিলু। রন্ধনে দ্রৌপদী।

—তাহলে দেখা হবে।

—বসবে না ?

—না, আজ বসব না।

—দেবাংশুর ওখানে তোমায় দেখলাম না।

—যাই না তো কেউ মরলে টরলে। চিঠি পাঠাই।

—তুমি একরকমই থেকে গেলে।

না, কেউ মারা গেলে যান না হিমাদ্রি। মৃত্যু বিষয়ে তাঁর মনে একটা বিতৃষ্ণা। মৃত্যু মানেই কান্না, বিলাপ, সৎকার নিয়ে কথাবার্তা। ভাল লাগে না।

হাঁটলেন একঘণ্টা। হাঁটার যে কতগুণ!

এমন ভ্রমণ, যাতে খরচ নেই।

এমন চিকিৎসা, যাতে ডাক্তার লাগে না।

এমন বন্ধু, যে সর্বদা সাহায্য করে শরীরকে।

বাড়ি ফিরলেন। এখন বসে জুড়োবেন। তারপর স্নান করবেন। টেবিলে বসলে মিলু দুটি মচমচে শুকনো টোস্ট, কিছু ফল, এক গেলাস পাতলা ঘোল দেবে।

তারপর হিমাদ্রি কাগজ পড়বেন। ন'টা থেকে বারোটা থাকবেন স্টাডিতে। সুপ্রতীপ তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনের স্মৃতিকথা নামক মহাগ্রন্থ টাইপ করবে। বইটা ইংরিজিতে হবে। অবশ্যই তাঁর স্বখরচে। কিন্তু এটুকু বিলাসিতা তিনি করতে পারেন। ছেলে রণজয়, সুপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার, হায়দ্রাবাদে থাকে। কলকাতা এলে হোটেলে ওঠে। দেখা করতে আসে। এবার এখানেই থাকছে।

—হঠাৎ এখানে থাকছে?

—আমি লিখেছিলাম।

হ্যাঁ, হেমকায়াই ছেলেমেয়ের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। ওরা 'মা' বলে না, 'হেম মা' বলে।

এখনও ক'দিন থাকবে। বাবার জন্মদিনটা এর মধ্যেই পড়ছে? তাহলে থেকে যাওয়া যাক, এ রকমই কথাবার্তা ওর। দূর্বা হেম-কায়ার অত্যন্ত অনুগত প্রজা। থাকে সল্ট লেকে, নতুন বাড়ি করেছে। প্রদীপ শহরের এমন এক হার্ট সার্জন, যার নাম মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। দূর্বা একটি কম্পিউটার কেন্দ্রে কাজ করে। আজ দূর্বা, প্রদীপ, মধুলা সবাই আসবে।

মধুলা তাঁর দৌহিত্রী, তৃতীয় প্রজন্ম, যাকে দেখতে পান। দূর্বা হিমাদ্রিদের বাড়িতে প্রথম মেয়ে, যে কেরিয়ার করেছে, অন্য জাতে বিয়ে করেছে হিমাদ্রির অমতে।

অবশ্যই হেমকায়ার সক্রিয় সমর্থনে। আর, দূর্বার বিয়ের ব্যাপারে হেমকায়া যখন কথা বলেন, হিমাদ্রি বিয়ের পূর্ব শর্ত আবারও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। হেমকায়া বলেছিল, তোমার আমার মধ্যেকার শর্ত তো আমি অমান্য করিনি। তুমি যা করো, বা যা বলো, আমি 'হ্যাঁ' ছাড়া 'না' বলিনি।

—বলবেই বা কেন? আমি কোন অন্যায়টা বলি?

—থাক ওসব কথা। কিন্তু রণো আর দূর্বার ব্যাপারে কোনও শর্ত তো হয়নি? তোমরা রায়চৌধুরি, প্রদীপ মহান্তি এতে আপত্তির

কী আছে ?

—অত্যন্ত জেদি মেয়ে তৈরি করেছ। ওর মায়ের সঙ্গে ওর এতটুকু মিল নেই।

—ও সব কথা অবান্তর। ভাল ছেলে, কৃতী ছেলেকে বিয়ে করছে, আর কী চাও ?

—বড়দা মেজদার মেয়েরা তো করেনি এ রকম।

—তোমার বড়দা আর মেজদার মেয়েদের সঙ্গে দূর্বার তুলনা করছ ? কিসে আর কিসে !

—দূর্বার মা থাকলে…

—দূর্বার মা থাকলে তো হেম মা থাকতই না বাবা ! তুমি এত ভুলে যাও !

দূর্বা বলেছিল।

—দূর্বা, তুমি খুব উদ্ধত হয়েছ।

—সে তো চিরকালই আছি। তবে দিদিদের বিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা বিয়ে করে নি। আমি বিয়ে করছি। এ ব্যাপারে হেম মাকে অযথা অপমান কোর না বাবা।

এত রেগে যান হিমাদ্রি, সে ঘর ছেড়ে চলে যান। দেবাংশু বলেছিলেন, তোমার মেয়ে যেমন ঝকঝকে, জামাই তেমনি নামকরা ডাক্তার !

—বাঙালী নয় !

—কাকে বলছ ? একটি জামাই, সে গুজরাটী, একটি পুত্রবধূ, সে পাঞ্জাবী। দিনকাল পালটে যাচ্ছে হিমাদ্রি, তুমি কি কিছুই বোঝ না ?

তবু হিমাদ্রি সহজ হতে পারেন নি।

দূর্বা আর প্রদীপের রেজেস্ট্রি এই বাড়িতেই হয়। হেমকায়া আর রণো দুজনেই বলেছিল, বাড়িতে অধিকার দূর্বার যত, রণোরও তত।

কোন লোকজনই ডাকা হয় নি। হিমাদ্রির মন রাখতে রেজেস্ট্রির পর কোন অনুষ্ঠানও হয় নি। লতু অবশ্য এসেছিল। চুলে পাক ধরে গেছে, স্বভাব ও মুখ তেমনি ধারালোই আছে।

লতু বলল, যাক! দূর্বা যে ওর মায়ের মতো হয় নি, এটা মস্ত বড় পাওনা।

প্রদীপদের বাড়ির রিসেপশান হয় ওদের লনে। ডাক্তার যত, সমাজের উচ্চকোটির মানুষও তত। লতু বলেছিল, দেখুন, এদের বন্ধুবান্ধব কি রকম সব!

বিশাল আয়োজন ছিল ওদের বাড়িতে। চা-কফি-কোল্ড ড্রিংকের ঢালাও ব্যবস্থা। মঞ্চে বিখ্যাত শিল্পী সেতার বাজাচ্ছেন। খুব বড় কেটারার, বুফে এবং বসে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বেনারসী পানওয়ালার ব্যবস্থা ছিল। প্রদীপের স্যার তাপস বসু হিমাদ্রিকে বললেন, আপনি খুবই সৌভাগ্যবান।

হিমাদ্রি স্মিত হাসলেন।

—দূর্বার মুখে তো শুধু হেম মা'র কথা শুনেছি। দূর্বাও, যাকে বলে জেম্ অফ এ গার্ল!

হিমাদ্রি স্মিত হাসলেন। মনে মনে একটুও খুশি হতে পারছিলেন না। তিনি "বিয়েবাড়ি" বলতে যা বোঝেন, এ যে তার চেয়ে একেবারে অন্যরকম।

বাড়ি ফিরে হেমকায়াকে বললেন, এ কি একটা বিয়েবাড়ি, না ফ্যাশান শো?

—ওরা অন্যরকম মানুষ!

—বড়লোকী দেখাতে গেছে!

হেমকায়া বললেন, দেখাবেন কেন? বাড়িটা নিজেদের। সেতার বাজালেন বসন্ত মিশ্র, উনি প্রদীপের মামাত দাদা। পরিবারে ডাক্তার, টেকনোলজিস্ট অনেক। খুব অভিজাত ব্যবস্থা হয়েছিল।

—রণোর বিয়েতে দেখিয়ে দিই নি?

হেমকায়া ঘরে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, রণোর বিয়ের পরিণতি এখন সবাই দেখছি।

হিমাদ্রির এ বিষয়ে যথেষ্ট বক্তব্য আছে। রণো যদি তেমন ব্যক্তিত্বধারী পুরুষ হত, বিয়ে ভাঙত না।

রণজয়ের বিয়ে তো প্রেমজাত নয়। হিমাদ্রিকে বারবার বলেছিলেন মহীতোষ, হিমাদ্রির বিশ্বাসভাজন মানুষ। খুব নাকি বড়লোক, তাদের একতমা সুন্দরী মেয়ে। ওরা বড় বংশ খুঁজছে, টাকা টাকা খুঁজছে না।

হিমাদ্রি বললেন, রণোকে রাজী করাতে পারে তার হেম মা। আমার কথার দাম সে দেবে না।

—আরে, মেয়ের ছবি দেখুক আগে।

হ্যাঁ, বনেদী বড়লোক এবং ব্যারিস্টার, মেয়েকে বিয়ে দেবার সময়ে ছবি পাঠিয়েছিলেন।

সদুঃখে দূর্বা বলেছিল. ঘটক পাঠালেই পারত ?

হেমকায়া বলেছিলেন, ঘটকালি তো আজকালও হয় দূর্বা! রং ঢং পালটে গেছে, এই যা! কাগজে বিজ্ঞাপনও বেরোয়, বিবাহ-যোগাযোগ অফিসও অনেক। আমাদের দেশে যা যা ছিল, তাই থেকেও যায়।

—দাদাটা যে কি অপদার্থ !

—সবাই কি একরকম হবে ?

—যাক গে, ভাল হলেই ভালো।

—আমার শুধু মনে হচ্ছে, অত বড়লোকের আদুরে মেয়ে রণোকে পছন্দ করবে তো ?

হিমাদ্রি বলেছিলেন, আরে! আগ্রহ তো ওদেরই। কন্যাপক্ষই আগ্রহ দেখাচ্ছে।

—রণো একে চাপা, তায় শান্তিপ্রিয় ছেলে !

—কেন ! বউ মানিয়ে নিতে পারবে না ?

—জানি না। ও সমাজটা তো জানিই না।

—আরে আমি তো জানি ! রণোর মা কি কম বড়ঘরের মেয়ে ছিল ? মানিয়ে নেয় নি ?

—দেখি, তুমিও দেখ !

—তুমি বললে রণো রাজী হবে।

রণজয় মধুমিতা বা মোমোর ছবি দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুন্দর, এত সুন্দর !

—দেখ হেম মা, ঠিক যেন····

—পরী না দেবকন্যা রে রণো ?

—সে সব নয়, তবে খুবই সুন্দরী।

—তোর পছন্দ তো ?

—হ্যাঁ, দেখতে ভারি সুন্দর।

সে ছবিটা গেল কোথায় ? কোন সমুদ্রের তীরে মোমো। আঁচল উড়ছে, লম্বা চুল উড়ছে, আশ্চর্য টানা টানা চোখ, ঝলমলে সৌন্দর্য।

লতু বলল, ইন্দ্রজিৎ বাবু আর তস্য পত্নী তো মেয়েকে নয়নের মণি করে রেখেছেন।

—চেনো ওঁদের ?

—তেমন নয়, তবে চিনি না বলব না।

—কেমন মেয়েটি, লতু ?

—তা তো জানি না। তবে আদুরে খুব।

—রণোর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন কেন ?

—আমার ধারণা, ওঁরা খুব বশংবদ ছেলে চান। যে ওঁদের প্রতি অনুগত থাকবে।

দূর্বা বলল, ঘরজামাই খুঁজছে না তো ? তাহলে কিন্তু দাদা রাজী হবে না।

হেমকায়া সদুঃখে বললেন, বালিগঞ্জ সার্কুলারে অত বড় বাড়ি,

অতগুলো কুকুর, দু'খানা গাড়ি। সে মেয়ে কেমন করে এখানে থাকবে? রণো তো ছবি দেখেও মুগ্ধ, আলাপ করেও মুগ্ধ।

দূর্বা বলল, অত ভেবো না তো! দাদা যদি সুখী হয়, তাহলে তো সবই ভালো।

হিমাদ্রি মনের সাধে জাঁকজমক করেছিলেন। মস্ত বাড়ি ভাড়া নেয়া হয় সাহেবী পাড়ায়, আলোর বালবে ছলমলে চাঁদোয়া, মস্ত সিংহাসন, কিছু বাদ থাকে নি। গয়না হিমাদ্রিই কিনেছিলেন। অবশ্য মেমোদের বাড়ির দিক থেকে আরো অনেক বেশি আড়ম্বর করা হয়।

রণো তখন মুগ্ধ, ধন্য। মোমোকে দেখলে রণো ভেসে যেত. যেন মন্ত্রাবিষ্ট হয়ে যেত। লম্বা হনিমুন হয়েছিল ওদের,—উটিতে অনেকদিন ছিল।

ফিরে এসে দিন দুই বাদেই মোমো বাপের বাড়ি চলে গেল। ওদের আত্মীয়স্বজনরা নবদম্পতিকে নেমন্তন্ন করে না. পার্টি দেয়। এত পার্টি. এত হৈ চৈ, সে একটা অন্য অভিজ্ঞতা।

হিমাদ্রি বেয়াইগর্বে গর্বিত ছিলেন খুব। মোমো ওঁকে ভীষণ ভালবাসে। নিজের বাবাকে "বাপী" বলে। হিমাদ্রিকে "বাবা"। কখনো "আপনি" বলে না. "তুমি" বলে। খেতে বসে যা খায়. তাই "লাভলি" বলে। অবশ্য কুকুরদের আদর করতে যখন তখন বাপের বাড়ি যায়, কি আর করা যাবে।

অসম্ভব হইচই, সুখ ও আনন্দে ভাসাভাসি কিছুদিন চলেছিল। মোমো এ সংসারে এক আদরণীয় অতিথির মত থাকত। হিমাদ্রির টোস্ট বা লেবুর জল. ঘড়ির কাঁটা মেপে খাওয়া, এ সবের রহস্যে ও ঢুকতে চেষ্টাই করে নি।

দূর্বা বলত, হাতে করে কিছু তো করতে হবে না. তবু একটু তো ভেতরে ঢুকতে পারে।

হেমকায়া কিছুই বলতেন না। মোমোর সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার

করতেন, রণোর মুখ দেখে মনে মনে প্রমাদ গণতেন।

মোমো মাঝে মাঝেই এ বাড়ির শান্ত জলে ঢিল ফেলত। যেমন, ও মা! বলিনি বুঝি? আজ তো মামের সঙ্গে ক্লাবে লাঞ্চ খাব।

—আজ তো আমার বন্ধুর ডান্‌স প্রোগ্রাম। তারপর কি ফেরা যাবে?

—আপনাদের পাড়াটা ভীষণ বাঙালী বাঙালী, তাই না?

—আচ্ছা, বাবা এ রকম করে সেবাযত্ন আদায় করেন কেন? আমার বাপী ত অন্যরকম!

তারপর বোঝা গেল, একটি শোবার ঘর, একটি বাথরুম আর একটি ব্যালকনিতে ওকে আঁটছে না।

—ম্যাচবক্স হাউস!

ও হরদম বলত।

রণোর সঙ্গেও খিটির মিটির বাধছিল। ক্রমে বোঝা গেল, শ্বশুর, সৎ শাশুড়ী এবং দূর্বাকে নিয়ে বসবাস করতে ও পারবে না।

হেমকায়া বলেছিলেন, তোরা কোনো ফ্ল্যাট নিয়ে চলে যেতেও পারিস। মোমো নিজের মতো থাকবে।

—ফ্ল্যাটে থাকবে মোমো? ওর বক্তব্যটা পরিষ্কার। ও একতমা মেয়ে। বালিগঞ্জ সার্কুলারের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে।

—তুই যেতে চাস?

—তা কখনো চাইতে পারি?

দূর্বা বলল, দাদা ওকে ধরে রাখতে পারবে না হেম মা! ওদের বিয়ে টিকবে না।

টেকে নি, বিয়েটা টেকেনি।

চার বছরের মাথায় মোমো চলেই যায় বাড়ি ছেড়ে। শ্রীজয়কে নিয়ে গেল। শ্রীজয়ের বয়স তখন দেড় বছর।

মাত্র দেড় বছরের ছেলে। মায়ের রং, নাক, ঠোঁট,—রণোর মত চোখ,—কালো ও কোঁকড়া চুল। শ্রীজয় মাঝে মাঝেই হাতে খাবার

নিয়ে খেতে ভুলে যেত।

হিমাদ্রি অনেক তর্জন গর্জন করলেন। দূর্বা আর হেমকায়া অনেকবার গেলেন। রণোকে নিয়ে মোমোর বাবা মা আলোচনায় বসলেন বারবার।

রণো ওঁদের প্রস্তাবে রাজী হতে পারে নি। শেষে মোমোই মানসিক নির্যাতনের ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদের কেস করে।

ডিক্রি পেয়ে রণোকে বলেছিল, আমরা বন্ধু থাকব, কেমন? আর সানিকে দেখতে তো তুমি আসবেই।

যখন বলেছিল, মোমো নিজের কথাগুলো বিশ্বাস করেছিল। মিষ্টি আন্তরিকতায় গলে পড়েছিল। বলেছিল, বিয়ে একটা অভিজ্ঞতা। সেটাও হয়ে গেল।

—ভাল থেকো মোমো, সানিকে সঙ্গ দিও।

—ও তো মামু আর বাপীর চোখের মণি।

এ সব বলে টলে মোমো তার মাসির কাছে চলে গেল বিলেতে। সানিকেও নিয়ে গেল।

এ বিচ্ছেদ ঠেকানো যেত কি না হেমকায়া জানেন না। পরে রণো বলেছিল, ও বরাবরই চেয়েছিল আমি ওদের বাড়িতে থাকি, ওদের মতো হয়ে যাই। এ বিয়ে তো হবার কথা নয় হেম মা, হয়েছিল ওদের গুরুদেবের নির্দেশে। ওর বাবা মা তো····

ছেলেকে দেখতে যাবার অনুমতি থাকলেও বিলেত কিছু বর্ধমান নয়, যে যাবে আর আসবে। রণো অবশ্য জন্মদিনে, বড়দিনে উপহার কেনার টাকা পাঠায়, ছেলেকে চিঠি লেখে।

এ সব ঘটনাও অতীতের কথা হয়ে গেছে।

পাঁচ বছর তো কাটল।

রণজয় হায়দ্রাবাদে আজ বছর চারেক। আগে বিয়ের কথা বললে 'না' বলত। হেমকায়া বলেছেন, ওখানে একটি মেয়ের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছে।

—চমৎকার! বাংলা ভাষী মেয়ে ছিল না?

—রণোই জানবে।

—কথা কইবে কোন ভাষায়?

—ইংরিজিতেই বলে নিশ্চয়। মেয়েও তো দিল্লিতে পড়েছে, ওর বাবা কোথাও সেক্রেটারিও ছিলেন।

—সংসারটা ভেঙে গেল।

—ওর জীবন, ওই ভাবুক না।

—বাড়ি, ট্রাডিশন, এ সব রণো বুঝল না। বুঝত, যদি আমার সঙ্গে কথা বলত! ও তো যত কথা তোমাকেই বলে।

হেমকায়া আস্তে বললেন, আমাকেও যদি বলতে না পারত, ওর অবস্থা কী দাঁড়াত?

—হ্যাঁ, দূর্বা, প্রদীপ, লতু, সবার সঙ্গে ওর খুব ভাব। এড়িয়ে চলে শুধু আমাকে।

—কোনদিন তো ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশোনি।

—আমার বাবার সঙ্গে তো আমরা কথাই বলতে সাহস করতাম না। বাবা আবার বন্ধু হয় কবে?

—রণোও করত না।

—কিন্তু বাবাকে ভক্তি করতাম।

—রণো তো অভক্তি করে না।

—তুমিই ওদের মাথাটা খেয়েছ।

—বলেছিলে, ওদের মা হতে হবে, মানুষ করতে হবে। অবশ্য ওরা এতই ভাল, যে আমাকে কোনও কষ্ট করতে হয়নি।

আজ, অনেক কথাই মনে পড়ছে।

হিমাদ্রি টেবিলে এসে বসলেন। রণো নেই, হেমকায়া নেই। ব্যাপার কী?

মিলু কোথায়, মিলু? সকালে তাঁর ট্রে তো সেই নিয়ে আসে। কালো রং মিলুর, মুখে বসন্তের দাগ। বছর বাইশ বয়স হয়েছে।

অত্যন্ত নম্র, ভীরু, শান্ত একটি মেয়ে। হেমকায়ার পেছন পেছন ঘোরে।

—মিলু! মিলু!

অধীর হয়ে হিমাদ্রি ডাকলেন। সময়ের মূল্য, তাঁর সময়ের মূল্য তো এ বাড়িতে সবাই জানে। খাবেন, উঠে যাবেন, স্টাডিতে ঢুকবেন, তাঁর দুর্গে। বাড়িটা তাঁর, এবং তাঁর নিয়মে চলবে, সেটা সবাই জানে। সাতাশ বছর আগে বিয়ে করেন হেমকায়াকে। সাতাশ বছর ধরেই হেমকায়া এ রুটিন মেনে আসছেন।

—মিলু!

রণজয় ওপর থেকে নেমে এল। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি হাঁটতে যাবার পরেই হেম মা ট্যাক্সি ডাকিয়ে মিলুকে নিয়ে চলে গেছেন। তোমাকে এই চিঠিটা দিয়ে গেছেন।

—চলে গেছেন?

—তোমাকে চিঠিটা দিয়ে গেছেন।

—হেম, তোমাকে চিঠি দিয়ে গেল?

—বাবা, চিঠিটা পড়ো।

রণোর গলায় যেন একটা আদেশের ভাব। হিমাদ্রি বললেন, পরে পড়ব।

পকেটে রাখলেন চিঠি। কি বিশ্রি ভাবেই না জন্মদিনটা শুরু হল! হেমকায়া মিলুকে নিয়ে কোথায় গেছেন!

হিমাদ্রির সকালের ব্রেকফাস্টের ওপর নির্ভর করে স্টাডিতে ঢোকার মেজাজ। স্টাডিতে সময়টা ঠিকমত কাটতে খাবার টেবিলে এসে বসেন। খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করেন না কোন। লতু তাঁকে বলে, একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন।

বোঝে না। ওরা বোঝে না। একটা লোক কি কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলেছে এই ডামাডোলের দিনে। নিয়ম মানতে জানে না বলেই বাঙালীর এই অবস্থা। হিমাদ্রি মনে করেন।

রাষ্ট্রকে মাঝে মাঝে সামরিক শাসনে রাখা দরকার।

মায়া একটি ট্রে রেখে গেল। একটি শুকনো টোস্ট, এক গেলাস ঘোল, কয়েকটি কাজু, নেহাৎ অভ্যাসবশেই খেলেন হিমাদ্রি।

—বাবা চিঠিটা পড়ো।

—তোমার যেন বড্ড তাড়া, রণো?

কোনদিন, কোনদিন বাপ-ছেলেতে সংবাহন নেই। কোনদিন দুজনে মন খুলে কথা বলেন নি। সে আন্দাজে রণোর বারবার একই কথা বলা একটু আশ্চর্য।

—তোমার কিসের তাড়া, রণো?

—দুর্বাকে আনতে যাব।

—এখন?

—চিঠিটা পড়ো!

চিঠিটা খুললেন। বিবাহিত জীবনে এটাই প্রথম চিঠি। সাতাশ বছর ধরে দুজনে একসঙ্গে আছেন। চিঠি লেখার দরকার হয় নি।

প্রথমার কথা মনে পড়ল। প্রথমা এখন একটা স্মৃতি, ধূসর হয়ে যাওয়া ছবি, কোন বেদনার্ত স্মৃতি বা শোক নয়।

বেচারি প্রথমা! এত অল্প বয়সে চলে গেল। এমন ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রেখে, সন্তানরাও মনে রাখেনি বোধ হয়।

প্রথমা নিয়ম করে পোস্টকার্ড লিখত, শ্রীচরণেষু,— তুমি কেমন আছ? আমরা ভাল আছি। শাশুড়ি মা পুরী যাচ্ছেন। কিছু টাকা তাঁকে পাঠিও। প্রণাম নিও।

স্কুলের মেয়ের মত গোটা গোটা লেখা। লেখার বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যহীন।

হেমকায়ার হাতের লেখাই চেয়ে দেখেন নি কোনদিন। হেমকায়া স্কুলের খাতা দেখছেন। বই পড়ছেন মন দিয়ে। "আরণ্যক" বইটি একাধিকবার ওর হাতে দেখেছেন।

—এক বই কতবার পড়বে?

—ভালো লাগে।

খবরের কাগজ পড়ছেন হেমকায়া। ছেলেমেয়ের সঙ্গে তুমুল তর্ক করছেন। রাজ্য, রাজনীতি, মেয়েদের অবস্থান, ভূপাল গ্যাস, কত বিষয়ে যে তর্ক হত!

হেমকায়ার লেটার বক্সে নিয়মিত চিঠি আসে। দূর্বা, লতু, রণো, সকলকে চিঠি লেখেন হেমকায়া। হেমকায়ার লেখাপড়ার টেবিল দূর্বা করিয়ে দিয়েছে। খাম, পোস্টকার্ড, সাদা খাম, ডাকটিকিট থাকে আলাদা খোপে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলে। বড় বড় চিঠি লেখেন হেমকায়া।

আজ হেমকায়া তাঁকে লিখেছেন।

সাদা প্যাডে হেমকায়ার নাম ও ঠিকানা ছাপানো। এ সব করিয়ে দেয় রণো ও দূর্বা। হেমকায়া বালিকার মতো খুশি হন। ওঁর চটি কেনে রণো। জামাকাপড় কেনে দূর্বা। হিমাদ্রি কোনদিন হেমকায়াকে কোন উপহার দিয়েছেন কি? হেমকায়া অবশ্য প্রতি জন্মদিনে কোন না কোন উপহার দেন হিমাদ্রিকে।

এ সব কথা এখন মনে হচ্ছে কেন? হিমাদ্রি চিঠিটা খুললেন।

সুন্দর, তেজী তেজী, স্পষ্ট হরফ। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। অবশ্য হেমকায়া কি সম্বোধন বা করতেন? "শ্রীচরণেষু" লিখতে পারতেন না। কোনদিন প্রণাম করেন নি। তবে পায়ে ব্যথা হলে মালিশ করে দিয়েছেন।

"প্রিয়তমেষু" লেখাও অবাস্তব হ'ত। শর্তের ভিত্তিতে বিয়ে। হেমকায়া শর্ত মেনে চলেছেন। "প্রিয়তমেষু" প্রথমাও লিখত না। হিমাদ্রিকে অমন অন্তরঙ্গ সম্বোধন করা বড় কঠিন। আরেকটি স্ত্রীলোক এসেছিল তাঁর জীবনে। সে লেখাপড়াই জানত না। হঠাৎ কেন তার কথা মনে হল?

ছোট্ট, সংক্ষিপ্ত চিঠি। হিমাদ্রি রণো নয় যে হেমকায়া বড় বড় চিঠি লিখবেন। বাংলায় বড় বড় চিঠি, মোটা মোটা খাম।

—বাংলায় কি লেখো অত ?

—রণোও বাংলাই লেখে। সব লিখি, কি রাঁধলাম, কোথায় গেলাম, হাসনুহেনা গাছে ফুল ফুটেছে কি না, কি বই পড়লাম, কি কি সিনেমা দেখলাম, ভিটামিন খাচ্ছি কি না !

এ চিঠিও বাংলাতেই লেখা।

—"মিলুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি মিলুরই জন্য। আর কোন উপায় ছিল না। মিলু আত্মহত্যার কথা ভাবছিল। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে রণো আর দূর্বা যা পারে করবে। মিলুর কোন সম্মানজনক ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই ফিরব। নইলে ফিরব না।"

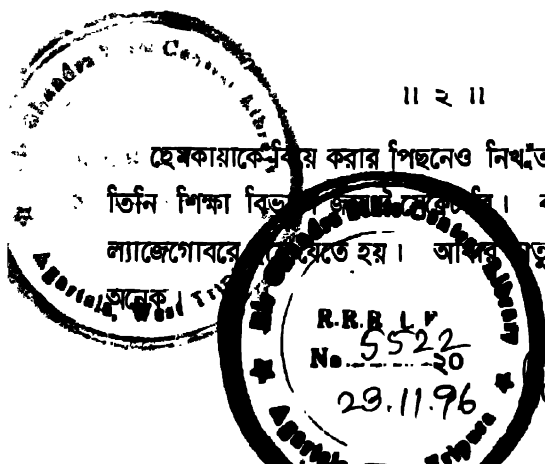
হিমাদ্রির চোখের সামনে অক্ষরগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল। এ কিসের পুনরাবৃত্তি তাঁর জীবনে ? প্রথমা আর মনোরমা। হেমকায়া আর মিলু। কিন্তু কি হয়েছে মিলুর ? কেন তার সম্মান-রক্ষা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠল হেমকায়ার কাছে ? মিলুর প্রতি হিমাদ্রি তো কোন অশোভন আচরণ করেন নি ? চেয়ে দেখেন নি সে কেমন দেখতে,—হেমকায়া তাকে অত্যধিক আগলে আগলে চলেন বলে বিরক্ত হয়েছেন। বলেছেন, ও তো মেয়ে নয় তোমার !

হেমকায়া ঈষৎ হেসে বলেছেন, সে তো দূর্বাও নয়।

বেহিসেব হয়ে যাচ্ছে সব, মিলছে না অঙ্কে। হেমকায়া মিলুর জন্য আজ চলে গেল ? না, হিসেবে মিলছে না।

॥ ২ ॥

হেমকায়াকে [illegible]য় করার পিছনেও নিখুঁত হিসেব ছিল। তখন তিনি শিক্ষা বিভা[illegible]। বউ মরে গেলে সব বয়সেই ল্যাজেগোবরে [illegible]যেতে হয়। অধি[illegible]তুন বিয়ে করার ঝুঁকিও অনেক।



শাশুড়ি সে সময়ে হিমাদ্রির সংসারে ক'মাস থাকলেন। প্রথমা তাঁর একতমা কন্যা, আর চারটিই ছেলে।

ছেলেরা যে-যার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ। বউ-ছেলে-মেয়েতে ভরাভর্তি সংসার। শাশুড়ি সে সংসারে সাম্রাজ্ঞী বললেও হয়। ছেলেরা মা বলতে গদগদ। বউরা শাশুড়ির অতীব অনুগত। শ্বশুর ছিলেন বড়লোকের ঘরজামাই। শাশুড়ির পা ও হাতে ছয়টি করে আঙুল। অপারেশনে গুরুদেবের মানা ছিল। তিনি বলতেন, "পাঁচটা আঙুল তো হকলেরই থাকে। তোমার বুচির ছয়টা আঙুল ক্যান্? ইয়ার পিছনে ভগবানের কুনো উদ্দেশ্য আছে, বোঝলা?"

সধবা অবস্থায় ছয় আঙুলে আংটি পরেছেন, রতনচূড়। বাড়ি তাঁর, আসবাবের ব্যবসা তাঁর বাবার, আমডাঙার জমিজমা ও পুকুর তাঁর। বুদ্ধিমতী জননী ছেলেদের বুঝিয়েছেন, আমার জীবৎকালে বাড়ি যেমন, তেমন থাকবে। আমি মরলে তোমরা যা হয় কোরো। চার ছেলে আমার, ঘরও তো বারোটা গো! একেক জনকে দুটো করে ঘর দিইছি।

—বাকি ঘরগুলো?

—তোমাদের বোন নিতে আসবে না। শুধু তো সরকারি বড় চাকরে নন জামাই, ল্যান্সডাউন রোডে বাপের তৈরি বাড়ি। অবস্থা কম কিসে?

না, অবস্থা কম ছিল না হিমাদ্রিশেখরের। যদিও ল্যান্সডাউন রোডের সে বাড়ি পরে বেচে দেন তিনি ও নীলাদ্রিশেখর। সর্দারশংকর রোডে জমিটা পান সুলভে। মালিক বিপদে পড়ে বেচে দেন। সেই থেকে তিনি স্বগৃহে গৃহস্বামী। না, সেই গোত্রের অফিসার নন, যাঁরা রিটায়ার না করলে বাড়ি করতে পারতেন না। এখনকার কথা আলাদা, চাকরি জীবনেই অনেকে বাড়ি করে।

দশবছর বয়েসেই প্রথমাকে পাখিপড়া করে শেখানো হয়েছিল, বিয়ের জন্যেই তাঁর জন্ম।

পড়ানো হয়েছিল বেলতলা স্কুলে। চৈত্রমাসে সাতসকালে মাটির শিব গড়ে পুজো করতে হত। শিবরাত্রির ব্রত পালন করতে হত। লালপাড় সাদা শাড়ি পরে মাটির দিকে চোখ রেখে স্কুলের বাসে উঠতেন।

বাড়িতে কড়াকড়ি, সর্বদা নজরে নজরে বাস, তার মধ্যেই কি আশ্চর্য, পাশের বাড়ির এক কিশোর তাঁকে প্রেমপত্র লিখে ছাতে ছুঁড়ে মারল।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বিচারসভা বসল। আজ প্রেমপত্র লিখবে, কাল বলবে, জানলায় দাঁড়াও। তারপর হয়তো আরো কিছু হবে।

প্রথমার মা ছেলে বউদের বললেন, আরো সিনেমা দেখাও? আরো স্বাধীনতা দাও? মেয়ে হল রূপের ডালি! রূপে কি করে মা? বদনামটি হলেই কেলেংকার!

প্রথমা তার পরিবারের যুক্তিগুলো বুঝতেই পারেনি। এখন থেকে স্কুল যাবে না, বাড়িতে পড়ে পরীক্ষা দেবে কেন? স্কুলে যে টুকু সময় থাকে, তাই তার কাছে স্বর্গ, বাড়িতে বন্দীজীবন কাটাবে কেন?

প্রথমা বলল, আমি সে ছেলেকে চিঠি লিখি নি। সে লিখেছে বলে আমাকে বন্দী করছ কেন?

মা বললেন, লেখাপড়া তো বিয়ের জন্যে মা! ঘরে বসে পরীক্ষা দেয় না কেউ?

—যদি কেউ ডাকে চিঠি দেয়, তাহলে কি করবে মা?

—অলক্ষুণে কথা বলিস না।

—আমি স্কুলে যাব। না যেতে দিলে কি করি তাই দেখো।

সর্বনেশে কথা বটে। কয়েকমাসও হয়নি, ক'বাড়ি বাদে মোড়ের বাড়ির মেয়ে বিনতা ছাত থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অন্যজাতের ছেলে, তায় গৃহশিক্ষক, তাকে বিয়েতে বাধা। মেয়ে ছাত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরল।

প্রথমার মা নিশ্বাস ফেলে বললেন, তাই যেও স্কুলে।

এটাই প্রথমার জীবনে প্রথম ও শেষ বিদ্রোহ।

বেলতলা থেকে ম্যাট্রিক, সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ থেকে বি. এ.।

ম্যাট্রিক পাশ করার পরেই অবশ্য জানা গেল, কোন এক বিয়ে-বাড়িতে প্রথমাকে দেখে হিমাদ্রির বাবা পছন্দ করেছেন।

প্রথমা লতুকে বলল, আমাদের বাড়িতে চিরকাল যা হয়েছে তাই হবে লতু।

এ সব কথা ও লতুকেই বলতে পারত।

প্রথমার একটি মাত্র মাসি। তিনি একেবারেই প্রথমার মায়ের মত নন। প্রথমার মাসিকে যিনি বিয়ে করেন, তিনি না কি স্বদেশী করতেন। ঘরজামাই থাকতে রাজী হন নি। নিজেও জমিদারের ছেলে, কিন্তু বাপের সম্পত্তিও নেন নি। শ্বশুরের এবং বাপের সম্পত্তি নেবে না এমন ছেলে যে ভিক্ষে করবে তাতে সন্দেহ ছিল না কারো।

কি আশ্চর্য, তিনি ভিক্ষেও করলেন না। শিক্ষকের কাজ নিলেন এবং স্ত্রীকে পড়িয়ে পড়িয়ে ম্যাট্রিক পাশ করালেন। তারপর বাঁকুড়ায় করলেন একটি মেয়ে ইস্কুল।

সবাই ছি ছি করেছিল।

—চাঁদা তুলে ভিক্ষে করে মেয়ে ইস্কুল গড়লি? বউটাও বোকা। সর্বস্ব সোনার গয়না দিয়ে দিল।

প্রথমা চিরকাল ছোটমাসির গল্প শুনেছে। তাঁরা ইস্কুলের পাশেই থাকেন ছোট্ট বাড়িতে। মাসি নিজেও স্কুলে পড়ান। ওঁদের গরু আছে, সবজির বাগান আছে, মাসি আর মেসো "ছোটলোকদের" মত মাটি কোপান, দুধ দোয়ান, দুজনে খুব ভাব। ওখানকার লোকজন মেসোকে খুব ভক্তি করে।

এ'দের ছেলেই সেই অদ্ভুত কাজ করে, যা প্রথমাদের বাড়ির কেউ

করে নি কখনো। একটি মেয়ের গান শ্নে ভাল লেগেছিল বলে তার সঙ্গে ভাবভালবাসা করে, বিয়েও করে।

প্রথমা মাসিকে দেখে নি, মেসোকেও দেখে নি। তবে এই মাসতুত দাদা আর বউদিকে দেখেছে। এরা প্রথমাদের বাড়ি আসে যায়। এই বউদির বোন লতু কলকাতায় এল ডাক্তারী পড়তে। বউদি বলল, মাসিমা, লতু আসাযাওয়া করবে কিন্তু।

—ও মা! মোটে চেনে না তো!

—আপনাদের গল্প শ্নে শ্নে....

—ডাক্তার হবে?

—ভাইরা তো পড়ল না। বাবা ডাক্তার, লতুও ডাক্তার হবে। আপনি ভাববেন না, লতু যা গায়ে-পড়া মেয়ে। পাথরকেও কথা বলাতে পারে।

সত্যি লতু এ বাড়িতে নিয়ে এল ঝোড়ো হাওয়া।

প্রথমার মাকে বলল, আমি কিন্তু "তুমি" বলি সকলকে। রাগ করতে পারবে না।

রাগ করলেই কি সে শ্নবার মেয়ে? প্রথমার মাকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে চোখের চিকিৎসা করাল। প্রথমার দাদার ছেলের টাইফয়েডে রাতদিন সেবা করল। যখনি আসে, অনেক মিষ্টি আর ফল আনে।

প্রথমার মা-ও গলে গেলেন।

তিনি তা বলে কথা শোনাতে ছাড়তেন না। চিরকাল কথা শ্নিয়েছেন, মান্ষ শ্নেছে। লতু কিন্তু কটকট করে জবাব দিত।

—তোর বে' হবে না লতু! যে মেয়ে মন্দানী হয়েছিস!

—তোমার মেয়ের তো বিয়ে হবে?

—ও মা! বে' তো কবেই হয়ে যেত। জামাই আবার বি. এ. পাশ মেয়ে চান।

—জানি তোমার জামাইকে।

—কেমন ছেলে, বল্?

—দেখতে ভালো নয়, গোমড়ামুখো, মেজাজী!

—বেটাছেলে যেমন হতে হয়।

—আমি কেমন মেয়ে গো?

—ওই! মন্দা মার্কা মেয়েছেলে!

—কি যে বলো!

—ডাক্তারী করা কি মেয়েদের মানায়? তোর দিদি কেমন ঘরসংসার করছে।

—গানও গায়।

—তোকে তোর মা কিছু বলে না?

—মোটেই না। মা খুব খুশি আমাকে নিয়ে।

—আমার বোন যদি তোর দিদির সঙ্গে ছেলের বে' না দিত, ভাল হত।

লতু হেসে গড়িয়ে যায়। বলে, দিত কী গো মাসিমা। দিদির গান শুনে তোমার বোনপো....

—তোর বাবার তো শুনি পয়সা আছে।

—বাবা তো খুব খুশি। বাবা বলেন, মেয়েকে এর-তার সামনে বসাব, তারা দেখবে, এ আমি কোনদিন পছন্দ করি না।

—তুমিও তাহলে দেখেশুনেই বে' করবে?

—দাদাদের দিয়ে তো হল না। বাবার অমন প্র্যাকটিস, অমন ডাক্তার·· আমি ডাক্তারি পড়ছি, বাবা ভীষণ খুশি।

—যা হোক বাছা, বে' হল আসল কথা। আমার প্রথমাকেই দেখ। লক্ষ্মী মেয়ে। বি এ পড়ছে, জামাই চান যে লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করবেন।

লতুর এ বাড়ি আসাযাওয়া প্রথমার মা বা দাদাদের পছন্দ নয়। কিন্তু সম্পর্কে কুটুম্ব। বাপ থাকেন বর্ধমানে। কলকাতায় হস্টেলে থেকে ডাক্তারি পড়ে। আসে, যায়, খায়, থাকে। বলা তো যায় না কিছু।

লতুর যাওয়া আসা প্রথমার বড় পছন্দ। কী স্বাধীন লতু! বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা যায়, বেড়ায়। ট্রামে বাসে ঘোরে। পুরুষ সহপাঠীদের সঙ্গে ডাক্তারি পড়ে, কী অন্যরকম জীবন!

লতু বলল, কী শুনছি রে প্রথমা?

—কী শুনলি?

—বর না কি বি এ পাস মেয়ে চায়?

—শুনেছিস তো!

—তাই তোকে পড়াচ্ছেন মাসিমা!

—কেন, পড়া কি খারাপ?

—তোর হবু বরটি কেমন মানুষ? বি এ পাস তো উনিই করাতে পারতেন।

—কী বলব, বল?

—তোর এ বিয়েতে ইচ্ছে আছে?

—জানি না ভাই।

—সত্যি! তোদের বাড়িটা একটা····

—বিয়ে ছাড়া আমার মতো মেয়ে কী করবে বল্?

—সেই তো কথা প্রথমা!

—আমাকে জিগ্যেস করে তো বিয়ে ঠিক হচ্ছে না। আর···· দাদারা বলে····ছেলে খুব ভাল।

—না, এ দেশে কিছু হবে না। তোর নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে নেই কিছু?

—মাকে তো জানিস! বেঁচে থাকতে বাবাও ওঁকে ভয় পেতেন। মা যখন ঠিক করেছেন····আর মা কি জেনেশুনে ক্ষতি করবেন আমার?

—কী জানি! মাসিমাও তোকে পুতুল করেই রেখেছেন। হিমাদ্রিবাবুও একটা পুতুলই চান····

—দেখ না, ছোটমাসি কত বলেছেন, একবারও যেতে দিলেন

বাঁকুড়া ? না, সেটা গরম দেশ। রং জ্বলে যাবে, চুল উঠে যাবে, বিয়ে হবে না।

—বিয়ে হবে বলে তোর ভাল লাগছে ?

—এখান থেকে তো বেরনো যাবে।

—আমার মনে হচ্ছে, এক খাঁচা থেকে আরেকটা খাঁচায় গিয়ে ঢুকছিস।

কার্যকালে অবশ্য লতুর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেলে না, মোটামুটি মেলে।

হিমাদ্রি ও তাঁর শাশুড়ি এ-ওর খুব মনোমত হন।

মেয়েছেলের জন্ম যে বিয়ের জন্যেই, সে বিষয়ে দু'জনেই একমত।

হিমাদ্রির মতে শাশুড়ির বেলা এটা 'গোঁড়ামি', কিন্তু তাঁর বেলা এটা মমতাময়তা। মেয়েদের ব্যক্তিত্ব রমণীয়, পুরুষের আশ্রয় ছাড়া সে কি বাঁচবে ?

শাশুড়ি মনে করেন, ম্যাট্রিক মানে উচ্চ শিক্ষা।

হিমাদ্রি মনে করেন গ্র্যাজুয়েশন উচ্চশিক্ষা। কেন না শিক্ষিতা মা ব্যতীত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শেখে না। শাশুড়ি মনে করেন, মেয়েকে রাশ ছেড়েছ কি, সে গোল্লায় যাবে।

হিমাদ্রি মনে করেন, মেয়েরা হটহাউসে লালনযোগ্য সুন্দর ফুল। বাইরের জগতের কুৎসিত অসভ্যতা থেকে তাদের বাঁচানো দরকার।

লতু বিষয়ে শাশুড়ির মত, ও মেয়েকে এখানে পুঁতলে বর্ধমানে গাছ বেরুবে।

হিমাদ্রি মনে করেন, লতু হল আজকের সমাজে যা দরকার, তেমন মুক্ত নারী।

লতুর সঙ্গে মাখোমাখো হবার চেষ্টা করেছিলেন হিমাদ্রি। বলেছিলেন, তোমাকে আমি সমর্থন করি লতু! আমি তো রক্ষণশীল নই। আমি শিক্ষিত, অতএব মুক্ত মন আমার। তোমাকে আমি····

—তবে আমাকেও বিয়ে করুন।

—বিয়ে ?

—কেন, দুটো বিয়ে করে না কেউ ? একটা বউ ঘরে থাকল, আরেকটা বউ বেরল ?

—ছি ছি ছি লতু····

—আয়নায় নিজেকে দেখেছেন। লণ্ঠনের মতো ঝোলানো মুখ, মাথায় টাক পড়ো পড়ো ?

হিমাদ্রির বিয়েতে অসম্ভব ধুমধাম হয়। তখনও বাজারে কেটারার ঢোকেনি। ফলে বিয়েতে বরকে যদি বসানো হয় ফুলের তৈরী দোলনায়। বৌভাতে বউকে বসানো হয় ফুলে গড়া ময়ূর সিংহাসনে।

তখনও ফুলশয্যা — গায়ে হলুদের তত্ত্বে ক্ষীরের মাছ, বুড়োবুড়ি, এ সব যেত। সানাইওয়ালা সানাই বাজাত। দু'বাড়িতেই গালচের আসনে বসিয়ে অতিথিদের খাওয়ানো হয়েছিল। লতু ছাড়া কেউ জিগ্যেস করেনি, প্রথমা ! তোর ভয় করছে না তো ?

লতু ছাড়া কাউকে প্রথমা বলেনি, বড্ড ভয় করছে। এরা সবাই কেমন কটকট করে চাইছে। কেউ বলছে, খাট কি বউয়ের ঠাকুমার ? পালিশ করিয়ে দিয়েছে ?

—ছি ছি !

—কী হবে লতু ?

প্রথমার এক জা বললেন, সরকারি অফিসার হোক, আর্কিটেক্ট হোক, এ বাড়ির ছেলেরা বিয়ে করে মায়ের দাসীই আনে।

লতু বলল,—এমন যদি কনজারভেটিভ, শিক্ষিতা মেয়ে চায় কেন ?

—ও টুকু নইলে চলে না। ছেলে মেয়েকে ভাল রেজাল্ট তো করতে হবে।

—তারপর ?

—মেয়েরা যাবে শ্বশুরবাড়ি, ছেলেরা করবে কেরিয়ার। প্রথমা তো ভাগ্যবতী। স্বামীর সঙ্গে দেশবিদেশ ঘুরবে।

প্রথম বিয়ের সময়ে তো হিমাদ্রি থাকেন কলকাতা। বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী নতুন বউ আগে পান চা-জলখাবারের ভার। বড় জা বলেন, তোর কপাল ভাল ভাই। এখন পাউরুটি-মাখন-জ্যাম সন্দেশ চলে। আমার কালে গোছাগোছা লুচি পরোটার চল ছিল। একটি পরোটা নিখুঁত না বেললে শাশুড়ি কাঁদিয়ে ছাড়তেন।

প্রথমার মনে হয়েছিল, সব বিষয়েই বাড়িটা বাপের বাড়ির মতো। তেমনি মেপে চলো, মেপে হাসো, দুপুরে ঘুমোও, বিউটি স্লিপ যাকে বলে। রোদ লাগিও না, বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখো না পার্কে শিশুদের খেলা।

তফাত কি নেই ? তফাত আছে। বাপের বাড়িতে তরকারি কোটেনি। আঙুলে কষ লাগবে। রান্না করেনি, তাপ লেগে মুখের রং ঝলসে যাবে। এখানে তরকারি কোটো, চা করো, রুটি সেঁকো।

আর হিমাদ্রির জামাকাপড় ইস্ত্রি করো। হিমাদ্রি গেঞ্জিটিও ইস্ত্রি না হলে পরেন না। তিনি ফেরার আগেই প্রথমাকে চুল বেঁধে কাপড় ছেড়ে সেজে গুজে থাকতে হয়। রাতে পুরুষরা আগে খান, মেয়েরা পরে। এ রকম সব ছোটখাট তফাত।

তবে হ্যাঁ, হিমাদ্রি পত্নীগত প্রাণ। তাই প্রথমা বাপের বাড়ি রাত্রিবাস করতে পারেন না।

হিমাদ্রি একদিন বললেন, তোমাকে তেমন হাসি খুশি তো দেখি না।

—আমি তো ওখানেও খুব হাসতাম না।

—এখন তো হাসবে ! আমাদের সেক্রেটারিও বলছিলেন, তোমার বউ বড় কম কথা বলে।

—এখন থেকে বলব।

—লতু কী চটপটে বলো তো ?

—লতু অন্য ভাবে মানুষ !

—ওকে আসতে বোলো ।

—বলব, আসবে কি না জানি না ।

—কেন আসবে না ?

—ওর হয়তো ভাল লাগে না । ও তো যা ইচ্ছে হয়, তাই করে । কোনদিন কারো কথা শোনে না ।

এমনি করেই চলছিল, চলছিল প্রথমার জীবন । কিন্তু বিয়ের দু'বছর যেতে না যেতে সকলে প্রথমাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল । সে মেয়ে মেয়ে কী, যার বিয়ে হয় না । সে বিয়ে বিয়ে কী, বউ যখন গর্ভিণী হয় না ? শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করার উদ্দেশ্য তো একটাই, সে সন্তানদের শিক্ষার ভার নেবে । মায়ের কাছে সন্তান ভাল শেখে, এটা হিমাদ্রির মধ্যের আধুনিক মনের সিদ্ধান্ত ।

হিমাদ্রির মনে হতে লাগল, প্রথমাকে বিয়ে করে তিনি ঠকেছেন । হিমাদ্রির মতো আর কে জানে, যে তিনি নপুংসক নন ?

লতু বলল, এত ভাবনা কিসের ? আমি নিয়ে যাব প্রথমাকে ডাক্তারের কাছে ।

—পুরুষ ডাক্তারের কাছে ?

—আপনি এক জগাখিচুড়ি বটে ! ঠিক আছে, মেয়ে ডাক্তারই দেখবে । ধরুন, ওর কোন ত্রুটি বেরল না, সে ক্ষেত্রে আপনিও ডাক্তার দেখাবেন তো ?

—ফাজলামি হচ্ছে ?

—ফাজলামিরই তো সম্পর্ক । আমার দিদি, ওর মাসতুত বউদি । সম্পর্কের আমি আপনার শ্যালিকা হলাম ।

—দেখো ! যা হয় করো ।

প্রথমা নিজেকেও হতভাগিনী ভাবতে শুরু করল । সন্তানহীনা নারী, ফলহীন গাছ বললে হয় । লতু বলল, গুচ্ছের বাংলা ছবি

দেখিস, আর প্যানপেনে গল্পের বই পড়িস। মাথাটা একেবারে গেছে তোর। এটা উনিশশো পঞ্চান্ন সাল মশাই। পৃথিবী এগোচ্ছে।

প্রথমা কাতর চোখে চাইল। সময় এগোচ্ছে? এ বাড়ি তৈরি ১৯১১ সালে। সেখানেই তো থেমে আছে সব। এঁরা মেয়েদের ধর্তব্য মনে করেন না। মেঘাদ্রিশেখর, নীলাদ্রিশেখর, হিমাদ্রিশেখর, ছেলেদের নিয়ে বাড়ি। মেঘাদ্রি যদি আরকিটেক্ট, নীলাদ্রি ও হিমাদ্রি সরকারি অফিসার। পরের মেয়েকে ভার্যা রূপে আনা, সে তো পুত্রার্থে।

লতু বলল, ভয় বা পাচ্ছিস কেন?

—যদি আরেকটা বিয়ে করে?

—সরকারি অফিসার? হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট পাশ হবার বছরে? কোর্টে কেস করলে নাকটি কাটা যাবে না?

—অমন করে বলিস না ভাই।

—নে, চলতো ডাক্তারের কাছে।

না, প্রথমার দেহযন্ত্র নিখুঁত। সন্তান হতে কোনও বাধাই নেই তার।

হিমাদ্রি বললেন, তবে হচ্ছে না কেন?

লতু বলল, আপনি ডাক্তারের কাছে যান না।

—তার····দরকার····হবে না।

কেন হবে না, তা ব্যাখ্যা করলেন না।

প্রথমার মা বললেন, ঠাকুরদেবতা, তাগাতাবিজ, মাদুলি কবচ করলে সন্তান হয় না?

প্রথমা বলল, কোথায় হয়? তোমার ভাইয়ের হয়েছিল? সে তো দু'বার বিয়ে করেছিল।

—তোর তো খুব মুখ হয়েছে এখন।

—বললে, তাই বললাম।

প্রথমা লতুকে বলল, ও আবার বিয়ে করুক গে।

হিমাদ্রির তখন প্রোমোশান আসন্ন। সতীর্থরা বললেন, হিন্দু বিবাহে দ্বিতীয় বিয়ে একটা অপরাধ। আর, ডাইভোর্স করতে পারো।

ডাইভোর্স! প্রথমত 'ডাইভোর্স' শব্দটাই অসহ্য। তারপর ডাইভোর্স করলে স্ত্রীও পুনর্বিবাহ করতে পারে।

লতু বলল, ডাইভোর্সই করুন মশাই। প্রথমাকে নিয়ে গিয়ে ওর ছোটমাসির কাছে রেখে আসি। সেখানে ও মানুষ হয়ে যাবে, নয়তো আমার দিদির কাছে।

হ্যাঁ, চারদিকে কেচ্ছা ছড়াক।

কেচ্ছা ও কেলেঙ্কারির ভয়েই হিমাদ্রি স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে এবং ডাইভোর্স করে আবার বিয়ে করতে পারেন নি।

তাঁর পরিত্রাতা হয়ে এলেন প্রথমার দাদা। তিনি হিমাদ্রিকে নিয়ে গেলেন বাঁকুড়ার সোনামুখীতে। সেখানে থাকেন তাঁর কুলগুরু। যাঁর প্রতিটি গণনাই অব্যর্থ। তিনি চারদিন ওঁদের আশ্রমে রাখলেন। কোষ্ঠি পত্রিকা বারবার বিচার করলেন। তারপর জলবৎ তরলং করে সব বুঝিয়ে দিলেন।

—তুমি তো বাবা অপুত্রক নও। শূদ্রাণীর গর্ভে তোমার একটি সন্তান তো হয়েছিল।

—সে একটা পদস্খলন বলতে পারেন।

তারা কি আছে?

না....টাকাপয়সা দিয়ে....।

হিমাদ্রির এখনও মনোরমার কথা মনে হয়। মনোরমা তাঁকে আকর্ষণ করত, উত্তেজিত করত।

প্রথমা যেন পুতুল। তাঁকে উত্তেজিত করতে পারে না। এ কথা কি বলা যায়?

—এ বিয়েতেও সন্তানাদি হবে। তারা বেশ নামকরার মতোই হবে। তবে এখন নয়। এখনও কয়েক বছর....যাকে বলে....

হিমাদ্রি একটি কবচ ধারণ করে ফিরে এলেন। প্রথমাকে অপার বিস্মিত করে বললেন, দার্জিলিংয়ে বদলি হচ্ছি। তোমাকে নিয়ে যাব।

—দার্জিলিংয়ে।

—বছর দুই, তারপর কুচবিহার, না বহরমপুর, সিউড়ি, না বারাসাত, জানি না।

দার্জিলিংটি অবশ্য মালদা হয়ে যায়। প্রথমা কিন্তু বেরতে পেরেই খুশি। শ্বশুরবাড়ি, বা বাপের বাড়ির নিষেধবন্ধন নেই। শুধু দু'জনে, শুধু দু'জনে।

ট্রেনে বসে প্রথমা বলল, তুমি তো সেই আপিসেই থাকবে। আমি কী করব ?

—সামাজিক জীবন আছে, মানুষজন যাবে আসবে। দেখো, তুমি সিঙাড়া, নিমকি করতে পারো তো ?

—করিনি তো কখন।

—শিখে নেবে, শিখে নেবে। ধরো ম্যাজিস্ট্রেট এলেন, নয়তো এস পি, যদি খাইয়ে দাইয়ে খুশি করতে পারো, আমার ভাল হবে।

প্রথমা কয়েক মাস বাদে লতুকে লিখল, "আগে বলেছিল বি. এ. পাস বউ দরকার। ছেলে মেয়ে ভাল লেখাপড়া শিখবে। বইগুলো নিয়েই এসেছি। কিছু তো মনে নেই। আবার পড়ছি ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হেনতেন। কোনদিন না কি মা হব। সেদিন যেন তাদের শেখাতে পারি। এখন বলছে সিঙাড়া—কচুরি—নিমকি—গজা—চপ—কাটলেট করতে শেখা দরকার। আমি নারী সমিতির বেলাদির কাছে রান্না শিখছি।

আর, বাগান করতে শিখছি মালীর কাছে। আগের হাকিম বাগান পছন্দ করতেন না। আমার খুব ভাল লাগে বাগান করতে, গাছ লাগাতে। ম্যাজিস্ট্রেটের বউ মিসেস আয়েঙ্গার বলেন, আমার আঙুলে জাদু আছে। এই প্রথম আমি নিজে কিছু করছি, যা

আমার ভাল লাগছে।"

এর পরের চিঠি, 'লতু, আমার গাছে ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফেলারা ফুটেছে। ছবি পাঠালাম। এখন দেখছি হিমাদ্রিও বেশ খুশি। একটু গর্বিতও, কেন না বাগান করলে অফিসারদের কাছে সুনাম পাওয়া যায়, এটা জানত না।'

প্রথমার জীবনে ফুলের বাগান করাটা এমন একটা জিনিস যা নিয়ে ও স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব খুঁজে পেল। কলকাতায় ও ছাদে বাগান করেছিল। ওর ডালিয়া প্রদর্শনীতে পুরস্কার পায়। আর কলকাতায় তো ফেরেনি, ফিরেছিল বারাসাতে। সেখানে আলাদা বাংলো, অনেক জমি। হিমাদ্রিশেখর প্রথমাকে 'দুই বোন' কিনে দেন। বলেন, গার্ডেনিং নিয়ে লেখা বই। পড়ে দেখো।

—পড়েছি।

—আমি ভুলে গেছি।

—সময় পেলে পড়ে দেখো।

সে সময় তো হিমাদ্রির হয়নি। বিয়ের বারো বছর বাদে রণজয় জন্মাল, মাকে কোনও কষ্ট না দিয়ে। লতু ততদিনে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। বলল, প্রথমা, দেখ কী সুন্দর বেবি হয়েছে।

—যাক, বাঁচা গেল। ও তো ছেলে চেয়েছিল।

এতকাল বাদে সন্তান, সেও ছেলে। প্রত্যাশিত ভাবেই প্রচুর ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন হল। ১৯৬৪ সালে পৃথিবী নিশ্চয় আরোই এগিয়েছিল। শুধু সে খবর প্রথমার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছয়নি। সোনামুখীর গুরুদেবকে গাড়ি চাপিয়ে আনা হল। তিনি কয়েক মিটার লম্বা একটি কোষ্ঠিপত্র করলেন।

হিমাদ্রি প্রথমাকে একটি হার দিলেন। প্রথমা বলল, এটা কি ছেলের মা হবার বখশিস?

—আমার বংশরক্ষা করলে, কৃতজ্ঞতা।

—মনোরমাকে কি দিয়েছিলে গো?

—মনোরমা ? সে কে ?

—তারও তো ছেলেই হয়েছিল।

—কে, কে বলল তার কথা ?

—তোমার বউদিরাই বলতেন, কবেই শুনেছি।

—থাক তার কথা।

—হ্যাঁ, আমি একটু ঘুমোই।

—সত্যি বলল, অবাক করলে প্রথমা। এ কথা বলার সাহস পেলে ?

—বারো বছর ধরেই শুনেছি, রণুর বাবা নপুংসক নয়। মনোরমার ছেলে তার প্রমাণ।

—সে কে ? কোথায় থাকে ?

—শুনেছি ওর চাপরাশির বোন। ঘরের কাজ করত। তাকে বোধহয় টাকা পয়সা দিয়েছিল। আমি কী করে জানব কোথায় থাকে ?

—তোমার ভয় করল না বলতে ?

—আগে হলে ভয় করত। এখন, অনেকদিন ভয় করে না।

বস্তুত, ছেলের দু'বছর বয়স না হতে প্রথমা জেদ ধরে। কলকাতায় থাকব। কলকাতায় না থাকলে ছেলের জন্যে ডাক্তার পাব না, স্কুলের অসুবিধে হবে।

—মায়ের কাছে আমরাও শিক্ষা শুরু করি।

—আমি তেমন মা হয়তো নই।

এই সময়েই, বা বছর খানেকের মধ্যে মেঘাদ্রিশেখর মারা যান। তারপর ল্যান্সডাউনের বাড়ি বিক্রি করে সর্দারশংকর রোডে হিমাদ্রি ও নীলাদ্রি আলাদা আলাদা বাড়ি তোলেন। মেঘাদ্রির স্ত্রী ছেলেমেয়ে ও ভাগের টাকা নিয়ে পিত্রালয়ে গেলেন। শাশুড়ি শেষ অবধি হিমাদ্রির ভাগেই পড়লেন। প্রথমা বললেন, এখন কি উনি আজ এর ভাগে, কাল ওর ভাগে থাকবেন ? আমার কাছেই থাকুন।

থাকলে কী হবে, ছেলের স্নান খাওয়াতে শাশুড়ির হস্তক্ষেপ

নিষেধ। কিছুকাল চেঁচামেচি, অনাহার, ছেলের কাছে বউয়ের নামে নালিশ করলেন।

খুব সুবিধে হল না। ও বাড়ি বেচে দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন নিয়মকানুনও চলে গেল। দু'বাড়িতেই বউরা স্বাধীন চলাফেরা করে। প্রথমা বাগান করে মন দিয়ে। নীলাদ্রির মেয়ে একদিন লম্বা চুল কেটে হাজির হল কাকিকে দেখাতে।

শাশুড়ি মূর্ছা যান, যান প্রায়।

হিমাদ্রি বললেন. স্মার্ট দেখাচ্ছে।

ঠাকুমা বললেন, বুদ্ধি দিল কে?

—কে আবার. আমি নিজেই চলে গেলাম কাটতে।

—হায় হায়, বিয়ে হবে কী করে?

—দেখতেই পাবে। ঠাকুমা একটু এগোতে শেখো। সময় বদলাচ্ছে।

—তোর মা কিছু বলল না?

—মার সময় কোথায়? মা রান্নার ক্লাসে যাচ্ছে।

—কালে কালে হল কী?

অঙ্ক অনার্স পড়া ঝকঝকে নাতনি বলল ও বাড়িটার নাম ছিল ঊনবিংশ শতক। এখন আর তখনকার নিয়মকানুন খাটাতে পারবে না।

—আমার ছেলেরা বা সইছে কী করে?

—না সয়ে করবে কী? তাছাড়া কাকি বাগান করছে, মা রান্না শিখছে নানা দেশের, অন্যায় করছে কিছু?

বাজে বকো না তো!

শাশুড়ি অগত্যা ঠাকুরঘর আশ্রয় করলেন। লতু বলল, পুজো করুন, সকালে লেকে হাঁটুন, ভাজাভুজি, ঘি, মিষ্টি কম খান, সেঞ্চুরি করে ফেলবেন।

—তুমিও তো মা বিয়ে করলে না।

—বিয়ে করার মতো মানুষই পেলাম না।

—সেই জন্যেই বলি, অত যদি না পড়তে····

—অত আর পড়লাম কোথায়। বাবা মারা গেলেন, বিলেত যাওয়া হল না। এখন তো প্র্যাকটিসে নামিনি। হেলথ সার্ভিস করছি। এবার নিজেরা একটা ক্লিনিক খুলব।

—ওসব বেটা ছেলেরাই করুক মা!

লতু মিষ্টি হেসে বলল, জানতাম, আপনি তাই বলবেন। কিন্তু আমাদের ক্লিনিকে আপনারা চিকিৎসার কত সুযোগ পাবেন, একবারও ভেবেছেন কি?

প্রথমা বলল, দেখো এসে কী চমৎকার ঝুমকোলতা ফুটেছে আমার বাগানে।

—বাগানে বসতে সময় পাও?

—রণোকে নিয়ে তো বসি।

—আবার সন্তানের কথা ভাবছ?

—রণো বড় হোক একটু।

রণোর পাঁচ বছর বাদে দূর্বা হয়। দূর্বা হবার আগে এই শান্ত নিয়মশাসিত, লতাকুঞ্জ ঘেরা বাড়িতে অনেক ঘটনা ঘটে যায়।

হিমাদ্রির মা কুণ্ডু স্পেশালে তীর্থ করতে গিয়ে পুরী ঘুরে আসেন। হিমাদ্রি ডাইরেক্টর সেকেণ্ডারি স্কুল বোর্ড-এর কী সব গণ্ডগোল ধরে ফেলেন। এবার প্রোমোশন। জয়েণ্ট সেক্রেটারির পদে তো বটেই। প্রথম দিকের আই-এ-এস তখনও দাপট খুব।

প্রথমা গর্ভাবস্থায় নানা অসুস্থতায় ভোগে। লতু বলে, এবার ডেলিভারিতে ভোগাবে বলে মনে হয়।

হিমাদ্রি লতুকেই বলেন, একটি ভাল মেয়ে পাওয়া যায় না?

—ভাল মেয়ে বলতে কেমন ভাল?

—প্রথমাকে দেখবে, রণোকে দেখবে। প্রথমা তাহলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে।

—প্রথমার ছোট মাসিকে বলব।

—তিনি কী করবেন ?

—অসহায় মেয়েদের নিয়েই তো পড়ে আছেন। কোন কোন মেয়ে যে কোন কাজ করে টাকা রোজগার করতে চায়। সব মেয়ে তো লেখাপড়া শিখব, নার্সিং পড়ব, সেলাই শিখব, ততটা চায় না।

—বিশ্বাসী হওয়া চাই। বিশ্বাসী।

—ওঁকে বলে দেখব। কিন্তু আপনি সাবিত্রীকে রাখুন না কেন।

—সবিত্রী কে ?

—হাসপাতালে আয়ার কাজ করে। নিজেই বলছিল, রোজ তো কাজ মেলে না। আমার মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি একটা ভাল বাড়িতে কাজ পেলেই করি।

—সধবা, না বিধবা ?

—আমি জানি না। বলে মেয়েদের বাপ বাংলাদেশে থাকে। সেখানে তার আরেকটা সংসারও ছিল। দশ বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই, থাকলে আছে, না থাকলে নেই।

—ম্যারেজ একটা ইনস্টিটিউশান লতু !

—সমাজের সর্বত্র নয়।

—না, তুমি সেই বিদ্রোহিণীই রয়ে গেলে।

—রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পর আর এগোতে পারেননি। অন্তত বাংলা ভাষায়। চলি স্যার !

—আমি সাবিত্রীর ইণ্টারভিউ নেব কিন্তু।

—নেবেন।

॥ ৩ ॥

সাবিত্রীর ইণ্টারভিউ হয়েছিল। প্রথমা উল বুনতে বুনতে মাঝে মাঝে হেসে ফেলছিল। হিমাদ্রি অতীব গম্ভীর।

—কী, নাম ধাম ল্যাখবেন ?

—লিখব।

—ল্যাখেন নাম সাবিত্রী সা ; বয়স তা আটতিরিশ হইব।

—ঠিকানা ?

—ভজন যাদবের বস্তি, হাতিবাগান বাজার। পাঠার দোকানের পিছনে।

—স্বামীর নাম ?

—নাম তো আছিল পীতাম্বর সা। অহনে দশ বৎসর সাক্ষাৎ নাই। অলপাইয়া আছে না নাই, কেমনে জানতাম ?

—কিন্তু....সন্তানাদি ?

—মাইয়ারা বিয়া কইরা কাইটা পড়ছে। অহন শুধা আপনি আর কপনি সম্বল।

—এতে তো বোঝা গেল না কিছু ?

—কী অত বোঝবেন ? লতু মাসি আমারে সাত বৎসর চিনে। কঠিন রোগী, যারে দ্যাখলে যম ডরায়, আমি তারে স্যাবাযত্ন করি। তিনি তো কইল, আপনের বউরে, পোলারে দেখনের লোক দরকার। দরকার থাকে, তয় টাকা পয়সা। কামের কথা কয়েন।

—হ্যাঁ, লতু তো তোমায় চেনে।

—চিনে মানে ? উনার বাপরে স্যাবা করতে তো লইয়া গিছিল। এগারো মাস বুড়ারে স্যাবা করছি।

—কত দিত ?

—তিনির মতো কে পারব ? মাস গেলে দুই শৎ টাকা, কাপড়

চোপড় রে, খাওয়াদাওয়া। কইত, তুমি বাড়ির একজন, সাবিত্রী! বাপ মরতে আমারে এক ভরি সোনার হার দিল! তার কথা থোয়েন। আপনাগো কী কাম, কত দিবেন, কয়েন!

হিমাদ্রি ইংরিজিতে বললেন, লতু কুত্তাকে লাই দিয়ে মাথায় উঠিয়েছে। কী বলব?

প্রথমা বললেন, আমি আবার কবে এসব ঠিক করি? তুমিই তো করো।

—অত পারব না। তবে···ধরো পঞ্চাশ?

খাওয়াদাওয়া তো পাবে?

—কার লগে কথা কন্? মাসে দুইশৎ টাকা আমি এমতেই কামাই। শোনেন, বউ পোলা রাইখা নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমি একশৎ টাকা নিমু। খাওয়াদাওয়া জানি পরিষ্কার মতো দেয়। ঘরের কাম করুম না। তয় কই, ডাকবেন সাবিত্রী বইলা। আর, কেউ যেন "ঝি" না কয়। "আয়া" কইতে পারেন। অহন সাফ সাফ জবাব দেয়, নয় আমি চল্লাম।

—বেশ, একমাস কাজ করো, দেখি!

ঘরে এসে প্রথমা হেসে কুটিপাটি।

—হাসছ!

—যাক, একজনকে দেখলাম, কথায় এঁটে উঠতে পারলে না। হিমাদ্রি যে রাগটা সাবিত্রীকে দেখাতে পারেননি, সেটা প্রথমাকে দেখালেন।

—তোমার জন্যেই লোক রাখার কথা উঠছে। মেয়েদের সন্তান তো হয়েই থাকে। সে জন্যে লোক রাখতে হয়?

প্রথমা আস্তে বলল, নিশ্চয়। তাই যদি মনে করো, তবে রেখো না।

—তুমি আমাকে অমানুষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছ।

—কী যে বলো! সেই কবে থেকে আমাকে তো গড়া হচ্ছে,

তোমার মনের মতো হবার জন্যে। আমি তোমার মুখের ওপর কোনদিন কথাও বলিনি। রণজয় হবার আগে লতু আসত বলে দেখেছে। আলাদা করে কোনও ডাক্তার কোনও ওষুধবিষুধ····

—কী বলছ বলো তো?

—কিছুই না। টাকা তোমার। মাইনে দেবে তুমি। এখন ভেবে দেখো।

—টাকাটা প্রশ্ন নয়, ওর কথাবার্তা···

—ওর তো তোমাকে দরকার নেই। তোমারই ওকে দরকার। তাই নয়?

—আমার দরকার? না তোমার?

প্রথমা উঠে গেল। হিমাদ্রি শুনলেন ও বলছে, লতু মাসি, মিছে দুশ্চিন্তা করছে সাবিত্রী। আমার কোনও লোকের দরকার নেই।

—সে তোমরা বুঝবে। এই হাত পা দেখি ফুলছে, রক্ত নাই দেহে, তাই দেইখাই তো মাসি আমারে····

লতু এসে বলেছিল, তুমি কি মরতে চাইছ প্রথমা? জানো, তোমার এখন কতটা আরাম দরকার? ওষুধ····ইঞ্জেকশান····রণোর পিছনে দৌড়ানো····

—আমি তো ওকে মাইনে দেব না ভাই! তাছাড়া লতু, মেয়েদের সন্তান হয়েই থাকে। সেটা এমন বড় কিছু নয় সংসারে!

—নিশ্চয় হিমাদ্রিবাবু কিছু বলেছেন।

প্রথমা নিরুত্তর।

—না, এতটা বর্বরতা সহ্য করা যায় না।

—আমার সয়ে গেছে লতু।

লতু এ কথা সকলকে বলেছিল। হিমাদ্রি এত রেগে যান, যে প্রথমার সঙ্গে কথাই বলতেন না। রান্নার লোক আছে। ঠিকে ঝি আসে। চাকর+মালী+দোকানবাজারের জন্যে একটি কিশোর,

এর পরেও লোক দরকার ?

প্রথমাও কথা বলত না।

দূর্বার জন্ম হয় মাকে গভীর কষ্টে ফেলে। আর দূর্বার জন্মের পর একলাম্পসিয়া হয়ে প্রথমা মারাও যায়।

॥ ৪ ॥

খুব, খুব কেঁদেছিলেন হিমাদ্রি।

নিজেকে জিগ্যেস করতেন, সেসময়ে লোক রাখলে কি প্রথমা বাঁচত ?

কেন রাখেননি ?

না, একশো টাকা মাস মাইনেটা কোনও ব্যাপার ছিল না। জেদ চেপেছিল, রাগ হয়েছিল।

তা বলে প্রথমা মরে যাবে, এ তো ভাবেননি। সে সময় দূর্বারও মরে যাবার কথা। কিন্তু দেখা গেল দূর্বার বাঁচার ক্ষমতা প্রচুর। খিদে পেলে চ্যাঁচায়, চক চক করে দুধ খায়। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বেশ স্বাস্থ্য।

প্রথমার মা এসে হাল ধরেছিলেন। তিনি লতুকে বলেছিলেন, কাজের লোক একটা দেখে দাও লতু। কচি মেয়ে মানুষ করবে কে ?

—ওর বাবা ভাবুন গে।

—সে তো তোমার বোন ছিল বললেও হয়।

—আমার বোন হলে অন্যরকম মেয়ে হত। আমাকে জ্বালাচ্ছেন কেন মাসিমা ? আপনাদের বাড়িতে এককালে ছাত্রজীবনে গিয়েছি, থেকেছি। তার প্রতিদানে এত বছর ধরে তো আপনাদের রোগে ভোগে অনেক করলাম।

—প্রথমার মেয়ে বলে কথা !

—প্রথমার····নাম····করবেন না।

হিমাদ্রিও বুঝছিলেন, শাশুড়ি বরাবর থাকবেন না। তখন মেয়ে নিয়ে কী করবেন?

নীলাদ্রির বউ বললেন, আমার পক্ষে অসম্ভব। নিজের কোলেরটার বয়স ন'বছর। আমি পারি ওইটুকু মেয়ে মানুষ করতে?

হিমাদ্রির মা-র যদিও ঠাকুরঘর সম্বল, এবং মাঝে মাঝেই কুণ্ডু স্পেশালে তীর্থে যান। সংসারের ব্যাপারে কথা কইতে ছাড়েন না।

তিনি বললেন, মা মরলে ছেলেপুলে কাকি জ্যেঠির কাছেই মানুষ হয়।

—ঠাকমার কাছে হয় না?

—তোমার কোলেরটি যদি ন'বছরের হয় বাছা, আমার কোলের সন্তান হিমুর যে তেতাল্লিশ। তাছাড়া আমাদের কালে ছেলে মানুষ করত ঝি।

প্রথমার মা অগত্যা থেকে গেলেন। প্রথমার দাদা বলল. মেয়ে থাকতে যেতে না, এখন যাচ্ছ?

—তা তোমরা যেমন পাষাণ. আমি তেমন হতে পারছি কই?

ঠাকমা দেখবে না, জ্যেঠি তো বাপের বাড়ি। কাকি হাত ধুয়ে ফেলে দিল। মামা মামীদের মনে হল. বোনঝিকে নিয়ে আসি? আমি বাছা, অকর্তব্য হতে পারব না।

—তোমার জামাইও তো মা! নেমন্তন্ন করলে আসেনি. প্রথমাকে ঘড়ি দেখে রেখে যেত, ঘড়ি দেখে নিয়ে যেত। তার কাছে মেয়ের কথা বলবে কে?

আরেক ছেলে, বলল, এখানে বা কাঁচ মেয়ে মানুষ করবে কে? এখন ওর দরকার যত্ন।

—লোক রাখতে হবে।

—ওই লোক রাখতে মেয়ে যদি রাজি হত তখন....জামাই তো একটার জায়গায় চারটে লোক....পেটের মেয়ে হলে কী হয়। কী স্বামী পেইছিল তা বোঝেনি। জামাইয়ের সব টাইমে টাইমে চাই।

তা সে তো বাগান নিয়ে পড়ে থাকত। কী জানি বাছা!

প্রথমার মা তাঁর খাসদাসী পদ্মর মেয়ে হিমানীকে কানপাশা কবুল করে জামাই বাড়ি নিয়ে এলেন।

হিমাদ্রি চিরকালই নিয়মের রাজত্বে অভ্যস্ত। প্রথমার মৃত্যুতে তাঁর অসুবিধে সবচেয়ে বেশি। টোস্ট কড়া হলে খান না, বেশি মাড় থাকলে জামা পরেন না, বিছানা নিভাঁজ টান টান না হলে শোন না। জুতোয় ধুলো আছে কি না ফুঁ দিয়ে দেখেন।

রণজয় কাঁদলে তিনি চমকে যান। প্রথমা থাকতে ছেলের কান্না তো শোনেননি। বারো মাস সকালে খান মুসুর ডাল সেদ্ধ, গলা ভাত ও ঘি। সামান্য ঘরে পাতা দই। আপিসে নিয়ে যান দুটো আটার রুটি, একটু তরকারি, একটি কলা। বিকেলে খান ঘরে তৈরি নিমকি বা লুচি। রাতে টোস্ট, মাংসের স্টু।

প্রথমার মা ক'দিনেই বুঝলেন, এ তাঁর সাধ্য নয়। জামাইকে বললেন, অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে। সে আবাগী তো ড্যাংডেঙিয়ে চলে গেল। তুমি বাছা! আবার বিয়ে করো।

হিমাদ্রি তখন, স্ত্রী বিয়োগের পর, মুখে যত কম কথাই বলুন, মনে তাঁর অনেক উন্নতমার্গের চিন্তা। যেমন, ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন।

—স্ত্রী বিয়োগে পতি, পতি বিয়োগে পত্নী, পুনর্বিবাহ ঈশ্বর অনুমোদিত নয়।

—কে করে বিয়ে? সংসার তো শুধু দুদিনের খেলা!

রাতে হিমাদ্রি খেতে বসলে, শাশুড়ি মাংস ও পাঁউরুটির স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে মোড়ায় বসে কথা বলেন।

—বে না করলে তোমার চলবে না।

—হিমানী তো বেশ চালাচ্ছে।

—ও আইবুড়ো মেয়ে। ওরও বে হবে। তাছাড়া কখনও কাজ করেনি কোথাও। নেহাত আমি বললাম বলে এখানে এসেছে।

—আপনিও থেকে যান না।

—সে কি হয় বাছা? জামাইয়ের ভাত খেতে নেই, নেহাত মেয়েটা চলে গেল বলে....

পাড়ায় যাঁর পসার সবচেয়ে বেশি, সেই ডাক্তার হিমাদ্রির বন্ধু। হিমাদ্রি মনে মনে ভাবলেন, ওঁকেই জিগ্যেস করব।

শাশুড়ি বললেন, বে করতে চাইলে মেয়ের অভাব? কত মেয়ের বাপ এসে পা ধরবে। আমার ভাইয়ের মেয়ে চন্দনাকে তো তুমি দেখেছ। দিব্যি মেয়ে। আই এ ফেল। ঘরে লোক রেখে সেলাই শিখছে। গান শিখছে, সব কাজ জানে। পুজোর জোগাড় দেয়া থেকে কনে সাজানো।

—না, আমার মন চায় না।

—তোমাকেই বা দেখবে কে বাবা? মানুষের দেহ, অসুখ বিসুখ আছে। ছেলে মেয়ে মানুষ করতে হবে। দায়িত্ব কি কম রেখে গেছে?

—সৎ মা কি যত্ন করবে?

—ঝি চাকরের চেয়ে তো ভাল হবে।

কী করবেন হিমাদ্রি? ছেলেটাকে হস্টেলে পাঠাবেন? মেয়েকে বিলিয়ে দেবেন? অফিসে, পাড়ায়, পরিবারে, সমাজে ঢি ঢি পড়বে না?

—আমাকেও ছুটি করে দাও বাবা।

—কয়েকটা দিন সময় দিন আমাকে।

॥ ৫ ॥

হিমাদ্রির জন্ম ১৯২৪ সালে। ১৯৬৭ সালে প্রথমা যখন মারা যায়, তখন তাঁর বয়স তেতাল্লিশ। সবে জয়েণ্ট সেক্রেটারি এডুকেশন হয়েছেন। অফিসে অনেকের মতে তিনি উল্কাগতিতে ওপরে উঠেছেন।

অনেকে ব্যঙ্গভরে বলে থাকেন, আর তো সতেরো বছর আছ। দেখ, চিফ সেক্রেটারি হয়ে যাও কিনা। সবই তো কপালে করে।

ঈর্ষা, ঈর্ষা। বড়লোকের ছেলে ছিলেন। প্রপিতামহের নামে উত্তর কলকাতায় একটি গলিও আছে। পৈতৃক ধনে সর্দারশংকর রোডে 'হিমাদ্রি নিবাস" বাড়ি করেছেন। বিয়েতেও প্রচুর পেয়েছেন। মদ বা সিগারেট খান না। কথা বলেন মেপে, গাম্ভীর্য রেখে। অফিসের কাজে গাফিলতি নেই। দেবাংশু বলত, শুধু কাজ দেখিয়ে উন্নতি হয় না রে ভাই। কাজ-না-করা স্বাধীন ভারতে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার।

—তবে কি খোশামোদ করব ?

—খোশামোদ করবে। রাজনীতি করবে....

—আই হেট পলিটিক্স। আমাদের বাড়িতে কেউ কোনদিন রাজনীতি করেনি।

—যারা করেছিল, তাদের বোলবোলাও দেখছ ?

—আমি দেখি না।

—বউও ভাল পেয়েছিলে। এখন তো বউদের উশকানিতেই স্বামীরা উন্নতির সোজা পথ খোঁজে।

—না ভাই। আমার স্ত্রী....

—তাঁর সাহসই ছিল না। এই তো ?

থাকবে কেন ? কী পায়নি প্রথমা ? শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, অফিসার স্বামী পেয়েছে। প্রচুর গহনাগাঁটি আছে তার। নিজের বাড়ি আছে। গাছপালার সঙ্গে কথা বলে। বাগান করে। বংশতিলক যে ছেলে, সে মায়ের মতোই রূপবান। একজন স্ত্রীলোক এর চেয়ে বেশি কিছু চাইবে কেন ?

স্ত্রী বারো বছর মা হয়নি। হিমাদ্রি কি আরেকটা বিয়ে করেছিলেন ? করেননি তো। অথচ হিমাদ্রির নিজের পিসিমাকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়েছিল। হিমাদ্রির বাবা ভগ্নীপতিকে

কিছুই বলেননি। বউয়ের যদি পরপর শুধু মেয়ে হয়, পুত্রার্থে স্বামী আবার বিয়ে করতেই পারে।

হিমাদ্রি তা করেননি। কিন্তু প্রথমা প্রথম ও শেষ দুর্ব্যবহার করল মরে গিয়ে। ছেলের স্কুল, মেয়ের কান্না, বাজার দোকান, এ বেলা কী রান্না হবে, কাপড় ইস্ত্রি হয়নি কেন, এসব কথা তো ভাবেননি কোনদিন।

শাশুড়িকে যাই বলুন, হিমাদ্রি আবার বিয়ের কথাই ভাবছিলেন। আশংকা শুধু, প্রথমার মতো কোনও মেয়ে পাবেন কিনা।

প্রথমা বেঁচে থাকতে যা মনে হয়নি, এখন তাই মনে হয়। জ্ঞান হওয়া থেকেই প্রথমা জানতেন, বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘর করবে বলেই মেয়েদের জন্ম হয়।

চোদ্দ থেকে ষোলো হল, ভয়ানক বিপজ্জনক সময়। চোদ্দ হলেই তো মেয়েরা বালিকা থাকে না, নারী হয়ে যায়। হিমাদ্রির বড় জ্যাঠা যখন জন্মান, হিমাদ্রির ঠাকুমার বয়স চোদ্দ ছিল। চোদ্দ থেকে ষোলো। মানে প্রলোভনের ডাকে ধরা দেবার জন্য একটি মেয়ের শরীর একেবারে তৈরি।

মনোরমার বয়স অবশ্য উনিশ ছিল। প্রথমার মতো হরতনের বিবি মার্কা ছবি ছবি সুন্দরী ছিল না সে। কালো, আঁটোসাঁটো, বর্বর যৌবনা মেয়ে। ওরকম মেয়ের প্রতি আকর্ষণ আজও আছে হিমাদ্রির। যদিও তা প্রকাশ করেন না।

কালো মেয়ে সুখশয্যায় ভাল। ফুলশয্যায় ফরসা মেয়েই মানায়। হিমাদ্রির মা তো রং দেখে দেখে বউ আনতেন। তাঁর বউরা ফরসা, ছেলেরা কালো। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর নাতনিরা ফরসা।

দূর্বা ফরসা নয়। কী করা যাবে। প্রথমার মতো দেখতে হবে না ও।

সব দিকেই যোগ্য ছিল প্রথমা। হিমাদ্রির সঙ্গে বিয়ে হবে। বেশ! হিমাদ্রি শিক্ষিতা মেয়ে চান। প্রাইভেটে বি. এ. পাশ করে

নিল। বিয়ের পর থেকে যা বলেছেন, তাই করেছে। কখনও উঁচু গলায় হাসেনি, স্নানের ঘরে গান গায়নি, বারান্দায় ঝুলে পড়ে রাস্তা দেখেনি।

সতেরো বছরের বিবাহিত জীবন। অর্থাৎ ছয় হাজার দুশো পাঁচদিন। প্রতিদিন হিমাদ্রি মচমচে টোস্ট পেয়েছেন, ধপধপে বিছানা, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। অফিসে যাবার জামাকাপড়, ঝকঝকে জুতো। বাড়িতে কোথাও ধুলো থাকত না। তাঁকে কোনদিন বলেনি, "বাজারে যাও", বা "রণোকে একটু দেখো"।

প্রথমা তাঁর এতই চেনা যে তাকে চেনার কোন চেষ্টা করেননি।

অচেনা প্রথমাকে একদিনই দেখেছিলেন। রণজয়ের জন্মের পর যখন হার দিলেন।

প্রথমা বলেছিল, মনোরমাকেও হার দিয়েছিলে ?

কী ভয়ংকর আঘাত ! জানত ও, মনোরমার কথা জানত, যৌথ পরিবারে জানাজানি হয়েই যায় সব। কিন্তু প্রথমা তা জেনেও কী নিখুঁত ভাবে পতিসেবা করে গেল।

যাক গে, সে অধ্যায় তো সমাপ্ত। কিন্তু হিমাদ্রি নিজেই বুঝতে পারছেন, বিয়েই তাঁকে করতে হবে। নইলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। প্রথমার মতো অমন দুধে ধোওয়া নরম বয়সী নিষ্পাপ মেয়ে নয়। শক্তপোক্ত, দায়িত্ব নিতে সক্ষম মেয়ে।

মহীতোষরা বলল, বউদির মতো মেয়ে পাবে কোথায় ? কেষ্টনগরে ফরমাশ দাও। মাটি দিয়ে গড়ে দেবে।

তারপর মন্ত্রবলে তাকে জ্যান্ত করে নাও।

নীলাদ্রি বললেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দাও।

লতু বলল, আবার বিয়ে কেন ? মোটা মাইনে দিয়ে দুটো ঝি রাখুন। অবশ্য আমি কোনও লোক পাঠাব না সাবিত্রীর কথা কি ভুলব কখনও ? না প্রথমাকে ভুলব ?

—বিয়ে একটা প্রয়োজন লতু !

—কই, আমি তো দিব্যি আছি।

—সবাই কি একরকম হবে?

—বিয়ে করতে গেলে আমি কিন্তু বাগড়া দেব।

প্রথমার মা বিরক্ত স্বরে বললেন, কত কষ্টে "হ্যাঁ" বলিয়েছি, তুমি আর বাগড়া দিও না বাছা! নিজে তো সংসার করলে না! সংসারের মর্মও বুঝলে না।

—কেন বুঝব না? ভাইপো ভাইঝিকে নিয়ে সংসার করি না? ওরা তো এখানে থেকেই পড়ে।

—তোমাদের বাড়িতে শুধু পড়া আর পড়া!

—এটা উনিশ শতক নয় মাসিমা?

—ওই সব পাকা পাকা কথা!

—নিন. মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, জামাইয়ের বিয়ে দিন এবার।

লতু দুর্বাকে দেখল, আদর করল, চলে গেল।

॥ ৬ ॥

হেমকায়ার সঙ্গে বিয়েটা দিলেন কিন্তু ডাক্তারবাবু। তিনিই বললেন, বউ না থাকলে আপনার তো চলবে না।

—আমার যেমন দরকার. তেমন মেয়ে পাব কোথায়?

—কচি খুকি চান না নিশ্চয়।

—না. না, আমারই তেতাল্লিশ।

—দেখি, খোঁজ রাখব। অনেকেই তো বলে টলে, দেখব অখন।

হেমকায়ার সঙ্গে বিয়ের পর হিমাদ্রির মা এবং প্রথমার মাকে, আত্মীয়স্বজনকে, বন্ধুবান্ধবকে, সকলকে মানতে হয়েছিল যে হিমাদ্রি ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। তিনিই যেমনটি প্রয়োজন, তেমনটি দেখে বেছে হিমাদ্রির বউ হিসেবে জুটিয়ে দিচ্ছেন। নইলে এমন হয় কী করে?

বস্তুত, তেতাল্লিশ বছরে আবার বিয়ে করার ব্যাপারটা হিমাদ্রির কাছে যেমন স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল, বাইরের জগতে তেমন নয়।

হিমাদ্রির দাদার শ্যালক বলে গেলেন, তেত্রিশ বছর বয়স আমার, বউ মরে গেল। আমি কি বিয়ের কথা চিন্তাও করেছি?

—আমার মেয়ে যে বড়ই ছোট।

—আরে আমার ছেলেরাও ছোটই ছিল। মা মানুষ করলেন। তোমার তো মা আছেন?

—মা পারেন না।

—লোক রেখে নাও।

—মাইনে করা লোক কি মায়ের জায়গা নিতে পারে?

—বিয়েই করবে তাহলে?

—অগত্যা।

—সৎমা কি আপন মায়ের মত হবে?

—সে একটা রিস্ক বটে।

ডাক্তারবাবুকেই ধরলেন হিমাদ্রি। নেহাৎ ছেলেমেয়ের জন্যে। নইলে কে ভাবে বিয়ের কথা? যে গেছে তার মত কি আর পাবেন?

না, তা পাবেন না।

—মেয়ে টেয়ের খোঁজ পাচ্ছেন?

—এখন আর দোজবরে বিয়ে দিতে চায় না সহজে। দিনকাল পালটাচ্ছে তো।

—আমি তো তেমন অপাত্র নই।

—সে তো আপনি বললে হবে না।

—দেখি, কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। এই যে শুনি মেয়েদের বিয়েই হয় না, মেয়ের বাপ গড়াগড়ি যায়, সে সব কি মিথ্যে?

—কাঁচ খুকি তো মিলবে না। ছেলে মেয়ের ভার নিতে হবে জানলেই মেয়েরা পিছিয়ে যায়।

—হ্যাঁ, দিনকাল খুব পালটে গেছে।

লতু কটকট করে প্রথমার মা-কে বলেছিল, ভেবেছেন কি সবাই আপনাদের মত? আপনার তো যা মতিগতি দেখছি, আরেকটা মেয়ে থাকলে এ'র সঙ্গে বিয়ে দিতেন!

প্রথমা আপনার মেয়ে ছিল না?

প্রথমার মা চোখ মুছে বললেন, ছিল, আমারই মেয়ে গেছে। কিন্তু সে যে আরেকটা মেয়ে রেখে গেছে, তার কি হবে বলতে পারো?

—সাবিত্রীকে নিয়ে দরাদরি না করলে ও থেকে যেত।

প্রথমা হয়তো একলাম্পশিয়াতে মারা যেত না।

এ সব আমি ভুলব কখনো মাসিমা?

—ভালই তো ছিল, সাধ খাওয়ালাম····

—থাক, প্রথমার কথা থাক। মোট কথা হিমাদ্রিবাবুর মতো মানুষ স্ত্রীকে মর্যাদা দিতে অক্ষম। কই, চেষ্টা তো করছেন, দলে দলে মেয়ের বাবারা এসে পায়ে পড়ছে? নিজে মানুষ করুন না মেয়েকে। এই তো ডাক্তার সরকার কি ভাবে দুটো যমজ বাচ্চাকে বড় করে তুললেন।

প্রথমার মা ফিসফিস করে বললেন, প্রথমা যে ঠাকুরসেবা করত লতু! জামাই জল গড়িয়ে খান নি কোনদিন।

—সেবাদাসী আসুন, সেবা করবে।

হিমাদ্রিকে দেবাংশু বললেন, নিজে ধর্মে মন দাও। আয়া রেখে মেয়েকে মানুষ করো। ছেলেকে হস্টেলে দাও। তোমার দেখছি বিয়ের বাজারে তেমন দাম নেই।

হিমাদ্রি এই প্রথম শুনতে থাকলেন, স্বামী হিসেবে তাঁকে পাষণ্ড বলা যায়।

প্রথমাকে তিনি ঝিয়ের মতো খাটাতেন। প্রথমার কোন সামাজিক জীবন ছিল না।

এ সবই নতুন জানলেন।

প্রথমার ওপরেই নিষ্ফল রাগ হল। এত দুঃখ ছিল তোমার?

আমাকে শুনতে হচ্ছে বাইরের লোকের কাছে ?

প্রথমা এখন ছবি। আশ্চর্য সুন্দরী একটি মেয়ে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর তো বয়স বাড়বে না, মেয়ে তো বড় হবে।

হিমাদ্রি ডাক্তারবাবুর কাছেই গেলেন। বললেন, আমার জন্যে নয়, ছেলেমেয়ের জন্যে বলছি। কত চেনাজানা আপনার। একটি মেয়ে দেখে দিন।

আমি সত্যিই বিপন্ন।

—আজকালকার মেয়েরা····রণোর মায়ের মত হবে না।

মানে····

—বুঝেছি। আমি স্ত্রীকে সম্মান করব, কখনো অসম্মান করব না।

—কয়েকদিন বাদে আসুন, একটু দেখি।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, একটি মেয়ে আছে, বিয়ে করতে পারেন। আপনাদের স্বজাতি।

—বয়স কম হবে না তো ?

—না, তিরিশ তো হবেই।

—লেখাপড়া জানে ?

—এম. এ. পাশ, অবশ্য বাংলায়।

—সে আমাকে বিয়ে করবে কেন ?

—আমার স্ত্রীর কথায়। তিনিই তার অভিভাবক।

—আপনি নিজে তো ····

—নিঃসন্তান। মেয়েটি বড় দুঃখী, মানে দুঃখই পেয়ে আসছে সারাজীবন। বাংলাদেশে থাকত ওর বাবা মা। মা আমার স্ত্রীর কোনওরকম লতায় পাতায় আত্মীয়। বোধহয় ১৯৬০ বা ১৯৬২ তে ওরা চলে আসে। বাবা নেই, দাদারা বা দিদিরা ওর ভার নিতে অক্ষম, তা আমার স্ত্রীই ওর লোকাল গার্জেন হয়ে ওকে হস্টেলে

রেখে পড়িয়েছেন। মা মারা যেতে আমরাই ওর সব হয়ে উঠেছি।

—দেখিনি তো কখনও ?

—আপনি বড় জোর চেম্বারে গেছেন। ক'বছর অবশ্য চেম্বার বন্ধ করি যখন, একটু গিয়ে বসেন। আমার বাড়ি যাননি।

—আপনার বাড়িতেই থাকে ?

—না, না। আজ আট বছর ধরেই তমলুকের কাছে একটা অর্গানাইজিং স্কুলে কাজ করছিল। স্কুলটা অনুমোদন পেল, তবে প্যানেল থেকে কিছু টিচার নিল। ওরও বি. এড. করা হয়নি। ওকে নিয়ে অশান্তি হচ্ছে, ও ছেড়ে দিল, বা দিতে বাধ্য হল। খুব আত্মসম্মানী মেয়ে। ছাত্র জীবন থেকেই টিউশনি করত।

—একদিন আলাপ হয় না ?

—যখনি বিয়ের কথা বলেছি, বলেছে টাকা পয়সা বা যৌতুক দিয়ে বিয়ে দেবেন তো ? সে আমি করব না। আলাপের কথা বলছেন, ওর এক কথা, যদি বিয়ে হয় তবেই ও কথাবার্তা বলে নেবে।

—দাদাদের, দিদিদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ?

—তারা যৎসামান্য কাজ করে, দূরে দূরে থাকে। বাড়িতে হেমকায়াই অন্যরকম। অবশ্য, খুলেই বলি, ওর মা নিজেও আত্মসম্মানী ছিলেন। দেশের বাড়ির বদলে মধ্যমগ্রামে জমিজমা, একটা ছোট বাড়ি পেয়েছিল ওরা। ওর কাকা সব ঠকিয়ে নিলেন। বিধবা মহিলা, লোকের বাড়ি রেঁধে বেড়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন। হেমকায়াকেই নিয়ে আসেন আমার স্ত্রী। ওর ভাই-বোনদের সংগতিও নেই যে ওর বিয়ে দেয়।

—আপনি রেকমেণ্ড করেন ?

—আমি তো ওকে শ্রদ্ধাই করি।

—মানে····ছ্যাবলা প্রকৃতির হবে না তো ?

—থাক হিমাদ্রি বাবু, আপনার কথাবার্তা শুনলেই আমার স্ত্রী

"না" বলবেন।

—মাপ করবেন। বলছিলাম কি, চপল তো নয়?

—চাপল্য আসবে কোথা থেকে? আমার স্ত্রী ওর গার্জেন, পড়িয়েছি আমরা, কিন্তু টিউশানি করেছে অনেক বছর, তারপর কাজ করেছে।

—তারপর?

—এত লড়াইয়ের জীবন হলে চাপল্য করবার সময় পাবে কোথা থেকে? আমার চোখে ওর মতো মেয়ে কোটিতে গোটিক।

—বিয়ে হয়নি কেন?

—আমাদের চেষ্টা করতেই দেয় নি। আর বিয়ের কথা উঠছে আমার স্ত্রীর চাপাচাপিতে। তাঁর শরীর তো ভালো নয়। হেমের বিয়ে না হলে উনি মরেও শান্তি পাবেন না।

—আপনার যা কিছু........

—হেম নেবে না।

—উনি বিয়ে করতেই চান নি?

—না। খুব অন্যরকম মেয়ে। যুবকদের ভরসা পায় না। কিসে রাজী হ'ল জানেন?

—কিসে?

—আপনার বিয়ের জন্যে পাত্রী খোঁজার কথা তো ও শুনেছে। সেদিন বলল, প্রৌঢ় লোক, ছেলেমেয়ে আছে, তাতে কি? এখানেই কথা বলুন। আমার বিয়ে না হ'লে তো আপনারা নিশ্চিন্ত হবেন না। কথা বলুন।

—ভাবি, কথা বলে দেখি কেমন লাগে?

ডাক্তারবাবু ঈষৎ হাসলেন। বললেন, ও কিন্তু কাদার পুতুল নয়, বিয়ে করলে ধন্য হয়ে যাবে, তাও নয়। ওর নিজেরও বক্তব্য থাকবে।

—নামটা সেকেলে, হেমকায়া।

—ওর মা রেখেছিলেন। রং পাকা সোনার মতো নয়। মানুষটা খাঁটি সোনা।

—বাড়িতে বলি....একটু ভাবি।

—ভাবুন। আমাদের স্বার্থ কি? কাছে পিঠে থাকবে। চেনাজানা মানুষ আপনি.......দেখুন, আপনার কথা আমরা বলি নি। আপনার স্ত্রী যে ভাবে মারা যান.......হেমই বলল।

হিমাদ্রির মনে হল, হাতি খানায় পড়লে ব্যাঙের লাথি খায়, কথাটা সত্যি।

—কি বলব বলুন! সোনার প্রতিমা তো আমিই হারিয়েছি।

ডাক্তারবাবু খুব অভিভূত হলেন না। নিরুত্তাপ সৌজন্যে বললেন, কথা খুব কম বলে। সকলকে সম্মান করে। সর্বদা সম্মানজনক আচরণ প্রত্যাশা করে। নীরবে সইবার মেয়ে নয়।

—না.......অসম্মান করব কেন?

এমন এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব করতে যাচ্ছেন শুনে হিমাদ্রির মা বেজায় শোরগোল তুললেন। কাঁদতে বসলেন প্রায়।

—মা রান্নার কাজ করত? রাঁধুনি ছিল? ছি ছি ছি, মেয়ের বয়স নাকি অনেক? তায় চাকরি করত?

—আরেকটা রণোর মা পাচ্ছ কোথায়?

—এ মেয়ে লতুর মতো হবে। দারোগামার্কা মেয়েছেলে। এ সব মেয়ে ঘরসংসার করে, না ছেলেমেয়ে দেখে?

—মা! এ বিয়ে তুমি দিচ্ছ না, আমি করছি। বিয়ে না করলে আমাকে চাকরি ছেড়ে ছেলেমেয়ে দেখতে হবে ঘরে বসে।

—কি দিনকাল হ'ল মা? বেটাছেলে, এমন সোনার চাঁদ ছেলে, তার বৌ জোটে না?

—থাক মা। চেষ্টা তো করেছিলে।

প্রথমার মা-ও খুব খুশি হন নি।

—ডাক্তারবাবু কাকে না কাকে ঘাড়ে চাপাবেন কে জানে।

আমার মেয়ের সাজানো সংসারে একটা রাঁধুনীর মেয়ে রাজত্ব করবে ?

—আপনি আপনার নাতনিকে নিয়ে যাবেন ? আমি খরচ দেব।

—খরচের কথা বলে অপমান কোর না বাছা। শরীরে কুলোলে মেয়ে নিয়ে যেতাম বইকি !

—কেউই যখন ছেলেমেয়ের ভার নিতে পারবেন না, তখন কথা বলবেন না আর।

—সৎ মা কি ছেলেমেয়েকে·······

—নিজের মা থাকলেও ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না সব সময়ে। সন্তান মানুষ হয় বাপের প্রভাবে। যেমন, আমাকে দেখুন।

হিমাদ্রির সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে মেয়েটির বিচারবুদ্ধি। সে যুবকদের বিশ্বাস করে না।

বুদ্ধিমতী মেয়ে !

॥ ৭ ॥

হিমাদ্রিকে ডাক্তারবাবুরা চায়ে ডাকলেন। যেমন নিয়ম। চা-পানের পর ওঁদের কথা বলতে দিয়ে সরে গেলেন। এটাও নিয়ম। হেমকায়া ফরসা নয়, কালোও নয়। চেহারায় চোখে পড়ার মতো হল, বাঙালি মেয়ে আন্দাজে বেশ লম্বা। কোনও সাজগোজের ধার ধারে না। চোখ বড় না হলেও উজ্জ্বল, আর লম্বা চুলে মোটা একটা বিনুনি বাঁধা। বাঁ হাতে ঘড়ি। সুন্দর নয়, অসুন্দরও নয়, ব্যক্তিত্ব আছে। গলার স্বর মৃদু ও সুন্দর। হিমাদ্রিই কথা শুরু করলেন।

—আপনি তো সবই শুনেছেন।

—শুনেছি, এঁরা যতটা জানেন।

—বুঝতেই পারছেন, প্রয়োজনে বিয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে, নইলে····

—প্রয়োজন তো আমারও। মাসিমার হার্ট ভাল নয়, ওষুধ খেতে হয়। আমার জন্যে খুব দুশ্চিন্তা করেন। বুঝতে পারছি, আমি বিয়ে করলে ওঁরা নিশ্চিন্ত হবেন।

—স্কুলে এতদিন চাকরি করে····

—পরের দিকে ভাল লাগছিল না। অনেক ঘোরপ্যাঁচ, অনেক কূটনীতি।

একটু হেসে বলল, ছাড়িয়ে না দিলে নিজেই ছেড়ে দিতাম। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে চলতাম না। কই, আপনি কী কী জানতে চান, বলবেন না ?

—বলব। ক'দিন সময় লাগবে।

—কোনও পণযৌতুকে আমি নেই।

হিমাদ্রি বললেন, সেসব কথা উঠছেই না।

—আমি বাংলায় এম. এ. ; লম্বায় পাঁচ ফুট, ছ'ইঞ্চি। কথা বেশি বলি না, আজ বলতে হল।

—এ বিয়ে তো নিজেরা, মানে দু'জন অ্যাডালট লোক বলে কয়ে বিয়ে হবে। আমার যেমন কিছু শর্ত থাকবে····

—আমারও থাকবে। আগেই সব বলে নেওয়া ভাল।

—ঠিকই তো। পরে যেন অসুবিধে না হয়।

—আজ তা হ'লে····

—হ্যাঁ, উঠি, নমস্কার।

—নমস্কার। আপনার নামটা বেশ····

—মা রেখেছিল। কেন রেখেছিল কে জানে। অনীতা, অলকা, আরতি, হেমকায়া।

—ওঁরা তো এখানে থাকেন না।

—কুচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি। দাদারা মধ্যমগ্রাম আর ক্যানিংয়ে। কেউ আসবে না।

সদুঃখে হেমকায়া বলল, মাসিমার কাছে টাকা চাইত, চাহিদা

বাড়ছিল। অথচ যে-যার মতো কিছু তো করে। আমিই ওটা বন্ধ করেছি। ফলে আমার ওপর রাগ।

হিমাদ্রি বেরিয়ে এলেন।

সকলকে বললেন, এমন মেয়েই ভাল। ব্যক্তিত্ব আছে। জানে কী চায়। বুদ্ধি, গাম্ভীর্য, সবই আছে।

অমিয় বলল, দেখো! তোমার স্ত্রীর মতো তো····

—কে আবার কার মতো হয়? সংসার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হব। বাড়ি টেনে চালাবে, আমি নিশ্চিন্ত হব। শাশুড়ি আছেন বলে শালা, শালাজ, তাদের সাত গুষ্টি····আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছি।

—দেখো! তোমার স্ত্রী-ভাগ্য তো ভাল।

—সুন্দরী নয়।

দেবাংশু বলল, দেখার চোখ পালটাও। আজকাল বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি দেখা যায়। ট্রাডিশনালি সুন্দর মেয়ে আর ক'জন?

হিমাদ্রি ভেবেছিলেন, একা তাঁর শর্ত থাকবে। হেমকায়া ওঁকে অবাক করে দিল।

হিমাদ্রি জানিয়েছিলেন তাঁর শর্ত।

রণজয় ও দুর্বার মা হতে হবে। ওদের মানুষ করতে হবে। এটাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তাঁর। তারপর, সংসার পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হেমকায়ার।

হিমাদ্রি তা নিয়ে কোনও কথা বলবেন না। আর, হিমাদ্রির ব্যক্তিগত চলাফেরা ইত্যাদি নিয়েও কোন কথা বলবেন না হেমকায়া। হিমাদ্রির মা এখনও এখানেই থাকেন। তাঁকেও দেখতে হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, ম্যারেজ এগ্রিমেণ্ট যখন, তখন হেমকায়ারও শর্ত আছে ও লিখে দিয়েছে।

রণজয় ও দুর্বার "মা" হতে পারবে না হেমকায়া। তবে দায়িত্ব নিয়ে পালন করবে। "মানুষ" করা বিষয়ে কথা দেওয়া যাবে না,

কেন না কে মানুষ, কে নয়, অত বড় কথা হেমকায়া জানে না।

সংসার পরিচালনার দায়িত্ব সে নেবে।

হিমাদ্রির কোন ব্যাপারে হেমকায়া কথা বলবে না যেমন, হেমকায়ার কোন ব্যাপারেও হিমাদ্রি যেন কথা না বলেন। আর একটা কথা, হিমাদ্রির বাড়ি বা সম্পত্তি, এর কোনও কিছুই হেমকায়া চায় না।

হিমাদ্রি বললেন, আমার অবর্তমানে?

—সে দায়িত্ব থেকে মুক্তিই দিলাম।

হিমাদ্রি কেন হেমকায়াকে বিয়ে করছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। হেমকায়া কেন এ বিয়েতে রাজি হল, সেটা জানতেন ডাক্তারবাবু ও তাঁর স্ত্রী।

স্ত্রী বললেন, যদি ওরা পরে জানে?

ডাক্তার বললেন, দোষ তো কিছু করছে না। তমলুকে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল। সাত বছর ধরে জেনেছিল ছেলেটি ওকেই বিয়ে করবে। ছেলেটি হঠাৎ ওকে ছেড়ে চাকরিদাতার মেয়েকে বিয়ে করল, তাতেই ওর মন থেকে বিশ্বাস চলে গেছে।

হেমকায়া ঘরে এসে বসল।

আমার কথা বলছেন?

—হ্যাঁ হেম, তোমার কথাই বলছি।

—আমি কোনও ভুল করছি না মাসিমা। আমার জন্যে আপনাদের মনে শান্তি নেই। মাসিমার হার্টের অসুখ আমিই বাড়িয়ে দিচ্ছি। এরকম বিয়েই আমার ভাল। ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, উনি আমার কাছে প্রেম, ভালবাসা, ইত্যাদি আশা করবেন না। ওঁর সংসারের দায়িত্ব নিলেই উনি নিশ্চিন্ত হবেন।

—তুমি ভালো থেকো মা।

—আমি তো ভালই থাকি।

কী বলবেন ডাক্তার দম্পতি? ছোটবেলা-থেকেই ওর দায়িত্ব

নিয়েছেন। কিন্তু হেম চিরকাল নিজেকে একটু তফাতে রেখেছে। উপকারক এবং উপকৃত, দুয়ের মাঝখানের লক্ষ্মণের গণ্ডী অতিক্রম করেনি।

বিয়েটা হয় রেজেস্ট্রি করে। না, হিমাদ্রির মা-দাদার ভাষায় "ভিখিরি বিয়ে" হয়নি। ডাক্তরবাবুরা লোকজন ডেকেছিলেন। হেমকায়াকে গয়নাগাঁটি দিয়েছিলেন। রেজেস্ট্রির পর আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়নি। তবে ছোটখাটো বৌভাত একটা হয়েছিল।

নীলাদ্রির স্ত্রী বলেছিলেন, ভল্‌ট থেকে প্রথমার গয়নাগাঁটি এনে সাজিয়ে দাও।

হেমকায়া বলেছিল, তা হয় না। ও গয়না তাঁর ছেলে ও মেয়ের। আর, আমাকে সাজাতে হবে না। আমি নিজেই সেজে নেব।

এসব নিয়ে অনেক মেয়েগজালি হয়। হেমকায়া সেসব গায়েও মাখেনি। কয়েকদিনেই হিমাদ্রির মা বুঝেছিলেন, এ প্রথমা নয়। ব্যক্তিত্ব আছে, কাজ ও কথার ওজন আছে। মেয়েগজালি পছন্দ করে না।

বিয়ের সময়ে প্রথমার মা নাতিনাতনিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফুলশয্যার পরদিনই হেমকায়া বলল—

—ওদের নিয়ে আসুন।

—এখনি?

—নিশ্চয়। এখন তো আমি আছি।

—কিন্তু....রণো তো বড় হচ্ছে....

—ওদের দেখার জন্যে তো আমি এসেছি।

—দুর্বার জন্যে হিমানীও আসুক?

—কোনও দরকার হবে না।

—শোবার ব্যবস্থা কেমন হবে?

—এখন তো আমার কাছেই ওদের থাকা দরকার। হিমাদ্রির

সঙ্গে রণজয় ঢুকেছিল। হিমানী দূর্বাকে কোলে করে এনে রেখে গেল।

হেমকায়াকে দেখিয়ে হিমাদ্রি বললেন, রণো! তোমার নতুন মা।

হেমকায়া বলল, না রণো। আমি তোমার হেম মা।

একমাসেই হিমাদ্রি বুঝলেন লাখ টাকার বিয়ে করেছেন। সকালের টোস্ট, বা অফিসের পোশাক, বা রাতের স্যুপ, সব আগের নিয়মে পেয়ে যান।

সংসার এবং বাড়িতে শ্রী ফিরল।

সবচেয়ে অবাক কথা। রণজয়ের মন জয় করে নিল হেমকায়া। আর দূর্বাকে এত যত্ন করে মানুষ করতে লাগল, যেমনটি দেখা যায় না।

সৎমাকে ছেলে কেমন করে গ্রহণ করে এটা দেখার কৌতূহল মানুষের থাকে। তাই মেঘাদ্রির বিধবা বউ ছোট বউকে দেখতে এলেন। বললেন, রণো সৎমা পেয়ে খুশি তো?

হেমকায়া বললেন, আপনার চায়ে ক'চামচ চিনি দেব?

—না, তার মতো নও বটে ছোট বউ।

—আমার নাম হেমকায়া।

—প্রথমার ছবিগুলো খোলনি?

—খোলার কথা ছিল?

— সর্বদা যদি মায়ের ছবি দেখবে....সৎমাকে তবে....

—শুনুন। এ বাড়িতে "সৎমা" শব্দটা উচ্চারণ করবেন না। রণো ভাল করেই জানে, ওটা ওর মায়ের ছবি। আমি ওর হেম মা।

--বড় যে আতিসুয়ো দেখছি। দেখব, নিজের দুটো হলে এ সব কোথায় থাকে।

হেমকায়া টেবিল ছেড়ে উঠেই গেল। বড় বউ গেলেন শাশুড়ির কাছে। শাশুড়ি হেমকায়াকে বললেন, এ তোমার বড় জা হয়।

অন্যায় তো কিছু বলেনি।

হেমকায়া রাতে হিমাদ্রিকে বলল, তোমার মা থাকবেন সে কথা ছিল। তোমার বউদিরা এসে রণোকে শেখাবেন আমি "সৎমা"। এ আমি সহ্য করব না।

—আমি যেভাবে চালাচ্ছি ছেলেমেয়েকে মানুষ করছি, সে নিয়ে কারো নাকগলানো সহ্য করব না। তোমার কাছে আমার পরিবার যেমন অসহ্য, আমার কাছেও তোমার পরিবার তেমনি অসহনীয়।

—হেমকায়া!

—আমি তোমার প্রথম স্ত্রী নই। শর্ত করে বিয়ে করেছ। শর্ত লঙ্ঘন কোরো না। করলে আমি চলে যাব, পিছন ফিরে তাকাব না।

—হ্যাঁ, জানি।

—আরেকটা কথা আলোচনা করে নেওয়া ভাল। আমি সন্তান চাই না। আমারও সন্তান হলে, আমি জানি না রণো আর দুর্বার প্রতি যথা-কর্তব্য করতে পারব কিনা। না পারাই সম্ভব।

—তার মানে····

—তুমিই ভেবে দেখো। সাবধান তোমাকেই হতে হবে। তুমিই ভাব।

—হিমাদ্রি বলেন, তুমি খুব কঠিন হতে পারো।

—হয়তো তোমার তাই মনে হবে। কিন্তু এখন তোমার তেতাল্লিশ, তোমার ছেলের পাঁচ, মেয়ের তিন মাস। এখন তোমার সন্তান হলে, তুমি রিটায়ার করলে সে নাবালকই থাকবে।

—তোমার নিজের····

—এই বয়সে?

হিমাদ্রি বুঝেছিলেন, হেমকায়াকে যুক্তি দিয়ে পরাজিত করতে পারবেন না।

হিমাদ্রির অভিযোগ করার মতো কিছু ছিল না। সংসার এমন

নীরবে, এমন সুশৃঙ্খলভাবে চলেনি কখনও। ছেলেমেয়ে যেন হেমকায়ার প্রাণ। কাজকর্ম সেরে তিনি আসবেন বলে হেমকায়া বসে থাকে না। দুর্বাকে ঠেলা গাড়িতে শুইয়ে গাড়ি ঠেলে লেকে চলে যায়, সঙ্গে দৌড়য় রণো। রণোর অনেক বন্ধু ওখানে, ওরা বল খেলে। সন্ধ্যার সময় তিনজন ফিরে আসেন।

রবিবার দেখলেন রণো নিজের স্কুলের জুতো রং করছে।

—রণো ওর জুতো রং করছে কেন ?

—রোজই তো করে।

—কিন্তু কেন ?

—জুতো রং করে। টেবিল গোছায়। অনেক কাজ করে।

—কেন, তাই তো বলছি।

—ওকে স্বাবলম্বী করে তৈরি করছি।

—আমি জীবনেও····

—তোমার জীবন তুমি কাটিয়ে যাচ্ছ। ও যখন বড় হবে তখন জীবন অনেক অন্যরকম হবে। তাছাড়া, নিজের কাজ নিজে করবে, এতে আত্মসম্মান বাড়ে। দেখো। আমি ওদের ভার নিয়েছি। আমি আর ওরা। এর মধ্যে ঢুকো না। তাতে ওদের ক্ষতি হবে।

—অর্থাৎ, তুমি চলে যাবে।

—হ্যাঁ। এ তো আগেও বলেছি।

আর লোক পাননি হিমাদ্রি। লতুকে এসব বলেছিলেন। লতু একটু হেসে বলল, এতদিনে জব্দ আপনি। প্রথমা আপনাকে ভয় পেত, হেম পায় না। ছেলেকে স্বাবলম্বী করে মানুষ করছে, যাতে আপনার মতো পরনির্ভর না হয়।

—আশ্চর্য, মা হতেও চায় না। এটা কি ন্যাচারেল ?

—জানি না। তবে খুব ন্যাচারেল হলে আপনার সঙ্গে টিকতে পারত ? প্রথমা পেরেছিল ?

—ঝগড়াই করে যাবে লতু ? যেন আমি একটা····

—নন, কিছুই নন। একটা ভাল চাকরি করেন, পৈতৃক টাকা পয়সা আছে। বাড়ি করেছেন। কে করে না? শুনুন, মিনার থেকে নামুন। বাস্তবতার মুখোমুখি হন। হেমকায়া একটি শ্রদ্ধা করার মতো মেয়ে। আপনি অভ্যস্ত কিসে? না সবাই আপনাকে ভয় পাবে, যারা আপনার আশ্রিত। আপনার যেটা লাগছে, তা হল হেমকায়া আপনাকে ভয় পায় না। এটা তো বোঝেন, ডক্টর বসুর দরজা ওর জন্য খোলাই আছে। আর এটা আশা করি বোঝেন, ও নিজের পেট চালাতে সক্ষম।

—সত্যি লতু। প্রথমা থাকতে····!

—কাঁদবেন না। সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তাছাড়া, প্রথমার বেলাও বোঝেননি কি পেয়েছিলেন। এর বেলাও বুঝছেন না। বুঝতে চেষ্টা করুন।

—তুমি খুব হৃদয়হীন।

—আপনি কী চাইছেন বলুন তো? একদা, ছোট ছিলাম, মাখোমাখো হতে চাইতেন। এখনও তাই চাইছেন?

—না লতু, তা মনে হলে····ক্ষমা কোরো।

হেমকায়াকে লতুই বলেছিল। সন্তান তুমি চাও না হেম?

—যদি বাপের মতো হয়?

—রণো?

—যাতে না হয় সেই চেষ্টাই করছি। যেটা খুব আপত্তিকর তা হল, ওদের বাবা কখনও ছেলের সঙ্গে আধ ঘণ্টা সময়ও কাটায় না। কখনও নয়।

—কারো জন্যই সময় খরচ করেনি। ঐ রকমই তো। প্রথমার বেলাও যা দেখেছি····

—যার এত চাই চাই, সে কী করে ভাবতে পারে····

—আমার মনে হয় কলকাতায় সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ফিউডাল দুটো বাড়ি প্রথমাদের আর এদের। হিমাদ্রিবাবু তার মধ্যেও····

নীলাদ্রীবাবু অন্তত····

—রণোর দরকার ভালবাসা। ওর বাবার ভালবাসা। যা ও বুঝতে পারবে। পায় না বলেই আমাকে····

—তুমি কিন্তু ওদের সত্যিই ভালবাসো।

—সেটাই স্বাভাবিক, না?

—কী জানি। আমি তো মাতৃত্বের অকাঙ্ক্ষী নই।

—আমি রণোর মা নই, হেম মা। ছেলেটা চাপা, সেনসিটিভ, নিজের মাকে ঘুমের মধ্যে এখনও খোঁজে।

—হয়তো প্রথমার মতো হয়েছে তবে।

—ছবি দেখে মনে হয় খুব নরম মানুষ ছিলেন।

—তা ছিল। ওর কথা থাক হেম। ওই যে বললাম, ওই দুটো পরিবার। বিশেষ প্রথমার পরিবারের মতো এমন ভয়ানক পরিবার আমি দেখিনি।

—অথচ তোমাদের আত্মীয়।

—কিসের আত্মীয়। প্রথমার ছোটমাসির ভাগ্যক্রমে বিয়ে হয় একটি খাঁটি মানুষের সঙ্গে। সত্যিকারের খাঁটি মানুষ। জাতীয়তা-বাদী ছিলেন, রাজনীতিতে নামেননি। স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখান, তখনকার দিনে আপার মিড্‌ল পাশ করান। দুজনে বাঁকুড়ার কাছাকাছি মেয়েদের স্কুল আর হস্টেল তৈরি করেন. চালান। নারী শিক্ষা বিস্তারে খুব উৎসাহী ছিলেন।

—তোমার কে। ওঁরা?

—ওদের ছেলে আমার দিদির গান শুনে প্রেমে পড়ে. বিয়েও করে। আমার বাবা বর্ধমানে ডাক্তার ছিলেন। ভাইরা কেউ ডাক্তারি পড়েনি। আমি পড়লাম। প্রথমা আর আমি এক বয়সীই হব। কলকাতায় পড়তাম। ফলে দিদির মাসশাশুড়ির বাড়ি আসতাম মাঝে মাঝে। তখন এরকমই নিয়ম ছিল। লতায়পাতায় আত্মীয়রাও আপনজন। সেই থেকেই যাওয়া আসা।

—সেই মেসো আর মাসি আছেন ?

—সপাটে বেঁচে আছেন। ওই স্কুল নিয়ে নয়। বাঁকুড়াতেই কোন গ্রামে কী এক সর্বোদয় কেন্দ্রে থাকেন। প্রথমাদের বাড়ি এখনও উনিশ শতকে, আর ওঁরা দুজন এক সময়ে যথেষ্ট প্রগতিশীল বলে বিবেচিত হতেন। আজকের লোকরা হয়তো ওঁদের সেকেলে বলবে।

—সেই জন্যেই যাও আসো ?

—ডাক্তার হয়েছি তো। চেনাশোনা একজন ডাক্তার থাকার সুবিধে ওঁরাও বোঝেন। আমি প্রথমাকে ভালবাসতাম। হয়তো ওর বিয়েটা দেখেই বিয়ের ব্যাপারে মন বিদ্বেষী হয়ে যায়, অবশ্য কথাটা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ হল না।

—আজ উঠি লতুদি।

—আবার "দিদি" কেন ? আমার ভাইপো-ভাইঝি-বোনঝি, এরা তো আমাকে লতুই বলে।

—রণোও লতু বলে।

—হ্যাঁ। কিন্তু হেম, তুমি নিজে কিছু করবে না ?

—নিশ্চয় চেষ্টা করব। ওরা বড় হোক। দুর্বার ওজন ঠিক আছে তো ?

—স—ব ঠিক আছে।

—আসি তাহলে ?

—এসো। তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে আমি খুব খুশি। একটু স্বার্থপরের মতো খুশি। রণো আর দুর্বার ব্যাপারে প্রথমাও তো হিমাদ্রিবাবুর শাসন মেনে নিতে বাধ্য হত। এখন তা হবে না। তোমার জন্য নিশ্চয়ই খারাপ লাগে। ভাবি কী পাবে এখানে।

হেমকায়া ঈষৎ হাসল। বলল, আমি তো জেনেশুনেই বিয়ে করেছি। আর ডাক্তার মেসোরা খুব নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আমার ব্যাপারে একটা নৈতিক দায়িত্ব ছিল তো ওঁদের মনে। দুজনেই

খুব ভাল।

—ডক্টর বোস তো আমাদের পড়াতেন।

—আসি লতু!

॥ ৮ ॥

আজ, সত্তর বছরের জন্মদিনের সকালে হিমাদ্রির অনেক কথাই মনে পড়ছে। প্রথমার সঙ্গে বিবাহিত জীবন সতেরো বছরের, তো হেমকায়ার সঙ্গে সাতাশ বছরের। সাতাশ বছরের জীবন, এরকম শূন্য করে দিয়ে চলে গেল হেমকায়া? এখন কি শর্তের কথা মনে করবেন হিমাদ্রি? হেমকায়া কী করে না করে সে বিষয়ে হিমাদ্রি কিছু বলতে পারেন না?

হঠাৎ খুব একলা মনে হল নিজেকে। খুব অসহায়। তিনি তো সদম্ভে চলেন। বুঝিয়ে দেন যে কাউকেই দরকার নেই তাঁর?

এখন তা মনে হচ্ছে না।

"মিলুর জন্য" বেশ লিখেছে হেমকায়া। কী হতে পারে মিলুর? অথবা মিলু কী এমন মানুষ, যে জন্য স্বামীর বিশেষ জন্মদিনটি উপেক্ষা করা যায়?

কেন এ জন্মদিনের উপর গুরুত্ব দিলেন হিমাদ্রি, তা জানতেও চাইল না। কেন বুঝল না দেবাংশুর মৃত্যু তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছে, তিনিও মারা যেতে পারেন? হেমকায়া তো জানে। হিমাদ্রি মৃত্যুকে কী ভীষণ ভয় পান? নিজের ছোড়দা নীলাদ্রির সময়েও শ্মশানে যাননি।

হেমকায়া বলে, মৃত্যুকে ভয় পাও কেন?

—ভয় নয়। কেমন একটা....

—তোমার তো কোষ্ঠীতে খুব বিশ্বাস। কোষ্ঠীই বলছে, তুমি বিরাশি অবধি বাঁচবে।

এখন তো তাও ভরসা দিচ্ছে না। বাড়িটা বা এত খালি খালি লাগছে কেন ?

রণো তো দুর্বাকে আনতে গেছে।

না, হেমকায়াকে বাধা হিমাদ্রি দিতে পারেননি। রণজয় আর দুর্বার বেলা তো একেবারে নয়। রণোকে নিয়ে কিছু ভাবতেই হয়নি হিমাদ্রিকে। বছর বছর যে ভাল রেজাল্ট করত তা নিয়ে হিমাদ্রি মনে মনে খুশি হতেন। আর মুখে বলতেন, বাপের ধারা পেয়েছে।

রণোর যখন দশ, আর দুর্বার যখন পাঁচ, তখন হেমকায়া পাড়ায় শিক্ষামন্দির স্কুলে মাস্টারিতে ঢুকল।

হিমাদ্রি বলেছিলেন, আমার স্ত্রী হয়ে তুমি পাড়ার স্কুলে পড়াতে যাবে ?

—তোমার স্ত্রী হয়ে বাজার-দোকান যাই, ছেলেকে মাঠে নিয়ে যেতাম, মেয়েকে স্কুলে পেঁছাই, চাকরি করতে যেতে পারব না কেন ?

—শিক্ষামন্দির তো নেবেই তোমায়, ডক্টর বোস অত টাকা দিলেন ওঁদের।

—মাসিমা মারা গেলেন। উনিও টাকা দিলেন। তাছাড়া, পড়াবার অভিজ্ঞতা আমার আছে।

—মেয়েরা কাজ করলে সংসার ভেসে যায়।

—আশ্চর্য তো ! আজকাল কোন্ মেয়েটা ঘরে বসে থাকে ?

—ছেলে মেয়ের অবহেলা হবে।

—পড়াব ছোটদের, সকালে। দুর্বা ওখানেই পড়ছে। ওকে নিয়ে বারোটায় ফিরব।

—যাবে কখন ?

—আটটায়।

—অর্থাৎ আমি বেরোবার সময়ে তুমি থাকবে না।

—না, থাকব না। আর যদি দেখি, চার ঘণ্টা স্কুল করলে

সংসার রসাতলে যাচ্ছে, তখন ছেড়ে দেব।

—ক'টাকাই বা পাবে ?

—স্কেল পাব না। তবে হাজার টাকা তো পাব।

—টাকার দরকার খুব ?

—হয় বই কি। বড়দির স্বামী মারা গেছে। চিঠি লিখেছে। ওকে ক'মাস টাকা পাঠালে ওর ছেলেটা পরীক্ষার ফল বেরোলে বাপের কাজটা পাবে।

—দেওয়াটা ভাল নয়। ওতে মানুষ····

—ভিখিরি হয়ে যায় ? তাই বলবে ? কী করব বলো। যোগাযোগ তো রাখি না। খবর পেলে স্থির থাকাটা ঠিক হয় না।

—রণো যখন যাবে····

—রণো নিজের জামাকাপড়, ব্যাগ গোছায়। টিফিন চেয়ে নেয়। স্বাবলম্বী করে দিয়েছি।

—সেটাও তো একরকম····আমরা কখনও····

—তোমাদের কালে····

হেমকায়া শান্ত গলাতেই বলেছিলেন, তোমাদের কালে, সব বাড়ির কথা জানি না, তোমাদের বাড়িতে ছেলেদের জন্য আলাদা চাকর ছিল। আমি রণোকে তেমন অভ্যেস করাইনি। এখনি লোক রাখা ব্যয়সাধ্য। ও যখন বড় হবে, তখন তো আরও ব্যয়সাধ্য হবে।

—সোজা কথা, তোমার কাজ করতে যাওয়া আমার ভাল লাগছে না।

—আমি কথা দিচ্ছি, যদি বাড়ির, বা ছেলেমেয়েদের কোনও কষ্ট হয়, কাজ ছেড়ে দেব।

—সেই বড়দিদির কথা তুলছ···

—বলেছিলাম ওরা আসবে না। কোনদিন আসেনি। লিখেছে বড়দির স্বামী যখন হাসপাতালে, আমার বাড়ি আসছিল বড়দা।

—চমৎকার !

—আসেনি। বাইরে থেকে বাড়ি দেখে ঢুকতে সাহস পায়নি।

—এক হিসেবে ভালই করেছে। ওরা আসতে থাকলে····

—ওরা আসত না। আমি তো শর্ত মেনে চলছি।

—শুধু ভাবি····আমি যেন নিরাপত্তা খুঁজেছিলাম। তুমি কী খুঁজেছিলে?

—এখানেই ব্যাকগ্রাউণ্ডের তফাত বোঝা যায়।

—হ্যাঁ, রণোর মা আর আমি, দুজনে অনেক তফাত।

এসব কথা কেন বলেছিলেন হিমাদ্রি?

"রণোর মা" বলাও তো ঠিক নয়। হেমকায়া ওদের যে ভাবে বড় করছে, আর কে পারত?

এখন হিমাদ্রির মনে হয়, অনেক সময়ে অনেক আঘাত দিয়েছেন হেমকায়াকে। অযথা অপমান করেছেন।

রণো যখন এই কাজ পায়, হেমকায়াকে বলেছিল, হেম মা! তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে তো?

—নিশ্চয় যাব মাঝে মাঝে। কিন্তু রণো তুই এতদূরে চলে যাচ্ছিস····

দূর্বা বলছিল, কী করবে? এখানে হাঁপিয়ে উঠেছে দাদা।

দূর আবার কী? তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ হেম মা। বিদেশে তো যাচ্ছে না।

ছেলে, মেয়ে আর হেমকায়া কেউই বোঝেনি, হিমাদ্রি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছেন। হিমাদ্রির মনে হয়েছিল, এখন আবার মনে হল, জীবনেও ছেলেমেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারেন নি।

কী হবে। হেম যদি না ফেরে?

"মিলুর জন্য" লিখেছে কেন?

হ্যাঁ, একদা পদস্খলন হয়েছিল হিমাদ্রির। সে তো পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছর আগে। কিন্তু মনোরমার কথা তো হেম জানে না? হঠাৎ মনোরমার নামই বা মনে পড়ল কেন?

হেম যদি না ফেরে ?

ছেলে এ শহরেই থাকে না। এলেও তাঁর সঙ্গে কথাই হয় না।

আর দূর্বাকে তো বলেইছিলেন। তোমাদের হেম মা বলছেন, আমি সহযোগিতা করছি এই মাত্র। কিন্তু মোটেই সমর্থন করছি না।

দূর্বা বলেছিল, ও বাবা! তুমি গ্রেট! সত্যি জ্যাঠারাও তোমার মতো ফসিল ছিল, তাই না ?

রণো বলেছিল, এই দূর্বা!

—চুপ কর দাদা। তুই এত ভাল মানুষ যে এ যুগে তুই অচল।

একদম!

হেম বলেছিলেন, আর না, দূর্বা!

—মোমোকেও ধন্য ধন্য। দাদার এত ভালবাসা···যা না, ছেলেটাকে নিয়ে আয় না।

—লাভ হবে কোনও ?

—অ্যাবসার্ড একটা বিয়ে হয়েছিল।

দূর্বার কথা ওইরকম। এই স্বাস্থ্য, ময়লা রঙ। ঝকঝকে চেহারা। চুল ছোট করে কাটা। প্রথমার সঙ্গে কোনও মিল নেই।

হেম মা ফিরলে ?

দূর্বা তাকে কতটুকু দেখবে ? দূর্বাকে তো তিনি চেনেনই না। সেদিন "দি টেলিগ্রাফ" কাগজে দূর্বা মহান্তির প্রোফাইল বেরিয়েছে। জিন্‌স আর পাঞ্জাবী পরে বসে আছে দূর্বা। ছি ছি ছি। বাঙালী মেয়েরা শাড়িও পরবে না ?

রণো হেমকায়াকে বলেছে, বাবা যদি এ শতকে ফিরত। দেখতে পেত মেয়েরা কতজন শাড়ি পরেই না।

—ওই কাজটাই তো অসম্ভব রণো।

—একে তো বাড়ির ব্যাকগ্রাউন্ড ওরকম। তারপর তুমিও আগলে রেখে রেখে····

—সব তোদের জন্যে।

—তোমাকেই জানে না বাবা। ভাবলে····

—আমি তো খারাপ নেই রণো।

—বাবার সঙ্গে বসবাস করার জন্যে তোমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত।

—অভ্যাস হয়ে যায় রণো। লোকটা বড় হতভাগ্য। নিজের লোকদের চেনে না। ধরে নেয় স্ত্রী অনুগত থাকবে। ছেলে মেয়ে অনুগত থাকবে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু মানবিক সম্পর্ক যে তৈরী করতে হয় তাতে ওরও কিছু করার আছে। তা জানে না।

—আমার তো মাকে সামান্য মনে পড়ে। মা কেন বা বাবাকে বিয়ে করেছিল তখন····

—বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

—তুমি তো নিজে বিয়ে করলে।

—খারাপ করেছি ?

—তুমি না থাকলে····কিন্তু বাড়িটা এর চেয়ে আনন্দমুখর হতে পারত।

—মোমোর জন্যে তোর খুব কষ্ট, রণো ?

—কষ্ট আগের মত হয় না। তবু····

—ওর বাবা মাও চলে গেছেন।

—জানি। ওরা বাড়িও কিনেছে। মোমোর মা বুটিক করেছেন। মোমো যে কী করছে····

—আর ভাবিস না। হ্যাঁ রে, বিয়ে কি করবি না আর ?

—তোমার এই একান্ত বাঙালী রুচির রণোকে কে বিয়ে করবে হেম মা ?

—সেই কৃষ্ণা আয়ার ?

—বুঝতে পারি না। আমি তো জানো....আমার দরকার একটি ঘরোয়া মেয়ে। আমাকে বিয়ে করে যে খুশি হবে।

—দেখাই যাক....

এসব কথাই হিমাদ্রিকে বলেছেন হেমকায়া। ছেলেমেয়ের প্রসঙ্গ নিয়েই তো যত গল্প ওঁদের।

হিমাদ্রি বলেছেন, রণোর অনেক ভাল বিয়ে দিয়ে উনি দেখিয়ে দেবেন।

হেমকায়া বলেছেন, রণোকে নিয়ে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা নয়।

এমনিতেই ও মরমে মরে আছে।

হিমাদ্রি বলেছেন, রণো তার ছেলেকে চিঠি লেখে?

হেমকায়া বলেছেন, জন্মদিনে তো লেখে। এর তার হাতে উপহারও পাঠায়।

তারপর বলেছেন, রণোকে নিয়েই ভাবনা। ও দুর্বার মতো নয়। অসম্ভব বুক চাপা। ওর মায়ের মতো হয়েছে কি?

হায়, আজ এ সব কথা মনে পড়ছে কেন? প্রথমার কথা বলেছিল হেমকায়া। কিন্তু কেমন করে বলতেন, প্রথমা তাঁর মনে অসম্ভব আবছা একটি ছবি।

প্রথমার কথা মনে পড়লে মনে হয়, ষাটের দশকের সর্দারশংকর রোড। আজকের তুলনায় অনেক নিরিবিলি। বাগানে ছোট্ট রণোকে নিয়ে ঘাসে বসে আছে একটি মেয়ে, যার মুখ আবছাই মনে পড়ে।

হেমকায়া অবশ্য ভুলতে দেননি। রণোর বিয়ের সময়ে প্রথমার গহনা ভল্ট থেকে আনলেন। সমান দু'ভাগ করলেন। সে সব "ও! অ্যান্টিক জুয়েলারি" অর্ধেক পায় মোমো। দুর্বার বিয়ের সময়ে বাকি অর্ধেকটা তাকে দেন হেমকায়া।

হিমাদ্রির ঘোর আপত্তি ছিল। হেমকায়া বলেছিলেন, এ কি তোমার সম্পত্তি? ওর মায়ের জিনিস ও পাবে।

দূর্বা ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল। কিচ্ছু নেব না।

হেমকায়া বলেছিলেন, যথেষ্ট হয়েছে দূর্বা। এগুলো তোমার। তারপর এ নিয়ে যা হয় কোরো।

দূর্বার বিয়ে নিয়েই বড্ড বাড়াবাড়ি করেছিলেন হিমাদ্রি। শেষ অবধি বিয়েটা হয় রেজিস্ট্রারের অফিসে। হেমকায়া বললেন, ছোটখাট রিসেপশান, সে বাড়িতেই হোক।

—কক্ষনো না।

—ছোট্ট রিসেপশান দূর্বা, আমি বলছি।

—কেন এমন করছ হেম মা?

—আমার আর রণোর খরচে হবে। এখানে কেন হবে বলু তো? আমার ইচ্ছা তাই।

—তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছ।

—আমার ইচ্ছা মতো একটা কাজ তো করতেই পারি। কোনদিন করিনি তা বলব না····

—থাক। হেম মা! আমি সব জানি।

—তোর বাবা····ওই রকম····কী করবি বল্? আমার স্কুলে কাজ করা নিয়ে····মেনে তো নিলেন।

—জানি না। বাবাকে আমার চিরকালই দুর্বোধ্য লাগে। আর এখন তো····কী ভাষা? প্রদীপ না কি উড়ে! ওরা চার জেনারেশন এখানে····হেম মা! তোমার হারটা কিন্তু দেবে আমাকে।

—খুব পছন্দ?

—খুব। তোমার গলায় থাকে তো!

—দেব। তুইও রিসেপশানটা মেনে নে।

হিমাদ্রিকে হেমকায়া বলেছিলেন, এখন একেবারে শান্ত হয়ে সহযোগিতা করো। নইলে····

—আমি আর কে দূর্বার!

—বাবা। আর আজ যদি ওর মনে ব্যথা দাও, কোনদিন ওকে

কাছে পাবে না।

সে কথাও তো মেনেছিলেন হিমাদ্রি। এ বাড়িতে, প্রদীপদের ওখানে। খুব সময়োচিত ভদ্রতা করেছিলেন। বাড়ি এসে অবশ্য বলেছিলেন, সবই হল, তবে তোমাদের মতে।

হেমকায়া বলেছিলেন, কেন এরকম হল, কেন ওদের কাছে আমার মতের এত দাম, এটা তোমার মতে কী? জানি, বলবে ওরা বাবাকে সম্মান করে না।

হিমাদ্রি বলেছিলেন, তোমার মতে কী?

—ওদের বড্ড দূরে সরিয়ে রেখেছ চিরকাল। এটা ঠিক করোনি। তোমার ছেলে মেয়ে অত্যন্ত ভাল।

—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ তো....

—তুমি বড় অভাগা, জানো? আপনজনদের চিনতে পারো না।

কী হবে হেম যদি না ফেরে?

॥ ৯ ॥

দরজায় বেল বাজল। হিমাদ্রি স্থানু হয়ে বসে আছেন!

রণো একলা ফিরল, একা?

দূর্বা ডাকল, বাবা!

রণো আর দূর্বা ঢুকল. হ্যাপি বার্থ ডে বাবা।

হিমাদ্রি চোখ ঢাকলেন।

রণো বলল, আমরা....সব সামলে নেব।

—তোমাদের হেম মা কোথায় গেছে?

দূর্বা বাবার পিঠে হাত রাখল। জীবনে এই প্রথম। চোখ ঢেকেই হিমাদ্রি অন্য হাতের আঙুলগুলো দূর্বার আঙুলের ওপর রাখলেন।

তারপর দূর্বা বলল, স্থির হও বাবা।

—মিলুর···কী হতে পারে ?

—আমি কিচ্ছু জানি না বাবা। দাদা জানিস কিছু ?

—আমি কী জানব ? এবার হেম মা লিখেছিল, বাড়িতেই থাকতে হবে যতদিন থাকি। বাবার সত্তরবছরের জন্মদিন আসছে। যেন ভুলে না যাই।

না, ভুলে যায় না রণো। একটা ফোনোগ্রাম সকালেই পেঁছে যায় বাড়িতে। রণোর শুভেচ্ছা।

দূর্বা বলল, বোস দাদা।

হিমাদ্রি বললেন, মধুলা ? প্রদীপ ?

—প্রদীপ তো সন্ধ্যায় আসবে। মধুলাকে ওই আনবে।

—ওইটুকু মেয়েকে ছেড়ে এলে ?

—ওর ঠাকুমা আছেন তো কিছুদিন। মধুলার লোকও আছে।

দূর্বা. যেন পরিবেশটা খুব সহজ করার জন্যেই বলল, তোমার নাতনির কথা আর বোলো না। সকলের কাছে থাকে, কোনও কান্না-কাটি নেই, কোনও বায়না নেই। সময়ে খাইয়ে দাও, নিশ্চিন্ত।

—প্রদীপের মা এসেছেন ?

—হ্যাঁ, এ সময়টা উনি প্রতি বছরই আসেন। এখন না হয় ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। এখানেই তো ছিলেন। অনেক বন্ধু আছে ওঁর।

—কিছু বলেনি হেম মা তোমাদের ?

—আমাকে কাল টেলিফোনে বলল, সকাল থেকে আসতে হবে। সব দেখে শুনে সামলাতে হবে। হেম মা'র কী কাজ আছে যেন। আর বলল, তুমি কিছু জানো না।

রণো বলল, আমাকে তো সকালে বলল। বাবা বেরোলেন, তখনি বলল, সব ব্যবস্থা করা আছে রণো। সন্ধ্যাবেলা খাবারদাবার সব দিয়ে যাবেন ইতু মাসিমা। তোমরা ভাইবোনে আজকের দিনটা সামলে দাও।

—সব ব্যবস্থা করে গেছে ?

—স—ব।

রণো বলল, অত ভেবো না বাবা। হেম মা কখনও এমন কোনও কাজ করে না, যার কারণ নেই।

—সেটাই তো দুশ্চিন্তার কথা।

—সে তো বলেছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই।

হিমাদ্রি বুঝতে পারছেন তাঁর এতদিনের উত্তরাধিকার। (স্বোপার্জিতও বটে) যে কাঠিন্য, তা ভেঙে যাচ্ছে। দুর্বল হয়ে পড়ছেন তিনি। বার্ধক্যের লক্ষণ। অবুঝ হয়ে যাচ্ছেন।

—তার ...যাবার কোনও জায়গা নেই....আমি চিন্তা করব না ?

—চিন্তা করলে টেনশান বাড়বে।

দূর্বা বলল, দাদা! হেম মা'র মাসিমারা কি আছেন ?

—মেসোমশাই তো ছিলেন বলে....

—লোকজন এলে কী বলা যাবে দাদা ?

—বলব, হেম মা'র স্কুলের কোন কলিগ অসুস্থ। আটকে গেছেন। বলব, ফিরতে পারলে ফিরবেন।

দূর্বা বলল, চলো বাবা, খাবার টেবিলে বসবে। গল্প করতে করতে রান্না করে ফেলব।

—তুমি রান্না করতে পারো ?

—দাদাও পারে। হেম মা কোন কাজটা শেখায়নি ? ফার্নিচার পালিশ, সুইচ পালটানো, ফিউজ মেরামত, রান্না, কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা।

আশ্চর্য, হিমাদ্রি এসব কিছুই জানতেন না। আর হেমকায়া রণোকে স্বাবলম্বী হতে কতটা শিখিয়েছে, দূর্বাকে কতটা, তাও জানতেন না। একেবারে নতুন নতুন লাগছে সব কথা।

রান্নাঘরের দায়িত্বে সরমাকে দেখে হিমাদ্রি যতটা অবাক হল,

দূর্বা বা রণো ততটা নয়।

—মাসি, কখন এলে ?

—কেন। সকালেই ? নাটকু আনতে গেল....দিদি অবশ্য বলেই রেখেছিল।

হিমাদ্রি অবাক। সরমা তো মিলুর মা।

হেমকায়ার স্কুলের ইতু যখন বাড়িতে কেটারিং ব্যবস্থা করল, সরমা ওখানে কাজ করত। মিলুকে হেমকায়াই এনেছেন। সরমা আগে স্কুলে কাজ করেছে।

—কী কী রান্না হবে তা জানো ?

—সব জানি বাছা। সব লিখে রেখে গেছে দিদি। তবে তুমি এলে, ভাল হল। মোচাঘণ্ট আমার হাতে তেমন হয় না।

রণো বলে, দিনের মেনু কী ?

—বাবা যা ভালবাসে ? মুগের ডাল, মোচাঘণ্ট, কইপাতুরি, পোস্তর বড়া আর চাটনি। দেখেছ, কী বড় বড় করে লিখেছে ? কিছু ভেবো না মাসি। স-ব আমি করে ফেলব। আগে একটু চা খাওয়া যাক। বাবা তো চা খাওই না।

—আজ....না হয় খাই।

রণো বলে, মাসিকে ছেড়ে দে দূর্বা। তুই হয়তো ডোবাবি।

—কতদিন রেঁধেছি, ডুবিয়েছি ?

সরমা বলে, করতে চাও, করো।

—কিছু না করলে তো ভালও লাগছে না।

ছেলে ও মেয়ে এত সহজ ব্যবহার করছে। হিমাদ্রি কি হেরে যাবেন ? হেমকায়া বলে, কোনও সময়েই নর্মাল হতে পারো না কেন ?

পারেন। হিমাদ্রি পারেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা তো অস্বাভাবিক এক পরিস্থিতিতে ঘটছে।

চা এগিয়ে দিয়ে দূর্বা বলে, বাবা তো চা খাও না। শরীর খারাপ হবে না তো ?

—না, না। দাঁড়াও, কাগজটা নিয়ে আসি।

ভাইবোন এ—ওর দিকে তাকায়। রণো বলে, সত্যি কাগজ দেখোনি ?

—না, কাগজ আর কখন দেখলাম। সকালে····

—চা খাও। পরে দেখো।

রণো বলে, হায়দ্রাবাদে আয়। মাংসের রেজালা যা রাঁধতে শিখেছি না ?

হিমাদ্রি বলেন, তুমি নিজেই রাঁধো ?

—সকালে তো ব্রেকফাস্ট তৈরি করে নিই। খেয়ে বেরিয়ে যাই। অফিসে লাঞ্চ করি। রাতে নিজেই করে নিতাম। এখন আমার এক কলিগের বাড়ি থেকে পাঠায়।

—তোমরা কি কাছাকাছি থাকো ?

—সবাই অফিসের কোয়ার্টারেই থাকি।

—আর সব কাজ ?

—আমি নিজে করি। অনেকে লোক রাখে।

দূর্বা বলে, মধুলা একটু বড় হোক।

—যথেষ্ট বড় হয়েছে।

—যাব। এবার শীতেই যাব। প্রদীপেরই সময় হয় না। সেজন্যেই তো····

—তুমিও তো বেরিয়ে যাও, দূর্বা।

—হ্যাঁ, তবে শনি আর রবি বাড়িতে থাকি।

দূর্বা চায়ের ট্রে নিয়ে চলে যায়। যেতে যেতে বলে, হেম মা পারেও। এই পেয়ালাগুলো কবেকার, বলতো দাদা ?

—উনিশ শো সাতাশি। তোমার বন্ধুর সেরামিকের এক্‌জিবিশান। মনে আছে।

এখন টেবিলে হিমাদ্রি আর রণো।

—রণো ?

—কিছু বলবে ?

—লতু হয়তো জানবে।

—কয়েকবার ফোন করেছি। তিতিল বলল, আজ অপারেশন করে লতু মাসি কখন ফিরবে ঠিক নেই।

—তিতিল ?

—লতু মাসির ভাইপো।

—আমি বলছিলাম....মানে মনে হয় খুবই....তুমি কি আর বিয়ে করবে না ?

রণো খুব সহজভাবে বলে, এখনও ভাবিনি। করলে তো জানবেই।

—তখন বুঝিনি....তোমার বয়সও কম ছিল....

—অতীত নিয়ে কথা বলে কী হবে বাবা ?

দুর্বা রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে, নাটকু এত দেরি কেন করছে রে ?

—এসে পড়বে।

—লাঞ্চের পর ঘুমোবি না দাদা। সব টিপ টপ করে ফেলতে হবে। খুব ভাল করেছে হেম মা, ইতু মাসিকে অর্ডার দিয়ে। মাসি, রুটি কি বাড়িতে হবে ?

—সব ওখান থেকে আসবে।

—সেটা কোথায়, দুর্বা ?

—পরাশর রোড বাবা, দূরে নয়।

—আমি....একটু কাগজ দেখি।

—স্নান করেছিলে ?

—হ্যাঁ....সকালেই....

সকালে স্নান করেছিলেন, টেবিলে এসে বসেছিলেন, তারপর থেকে জীবনটা হঠাৎ ওলটপালট। কেননা হেমকায়া নেই। এ অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবেন কী করে, তা হিমাদ্রি জানেন না। কেননা প্রথমার সঙ্গে সতেরো বছর, হেমকায়ার সঙ্গে সাতাশ

বছর কেটেছে। চুয়াল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এমন একবারও ঘটেনি যে স্ত্রী চলে গেছেন, তিনি পড়ে আছেন।

হঠাৎ মনে হল। রণোর কেমন লেগেছিল?

নিশ্চয় প্রচণ্ড লেগেছিল। সে জন্য এখনও বিয়ের কথা তুলতেই এড়িয়ে যায়।

না, বত্রিশ বছর বয়সে ছেলেটার জীবন অভিশপ্ত হয়ে যাবে, এ হয় না।

হেমকায়া ফিরে এসো। তোমার রণো যাকেই বিয়ে করুক, আমি মেনে নেব। আজ তো দেখতে পাচ্ছি, তোমার কথার সম্মানে ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। না দাঁড়াতেও পারত। ছেলেমেয়ের সঙ্গে কখনও ঘনিষ্ঠ হইনি।

মাতৃহারা রণোকেও ঠাকুমা বা দিদিমার কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। হেমকায়া না এলে....

কাগজ খুললেন, কাগজটা রণো পড়েছে। ভাঁজ করে রেখেছে। অভ্যাস মতো পার্সোনাল কলাম দেখলেন। এ কলামটা দেখেন মৃত্যু সংবাদ পড়ার জন্যে। চেনা জানা, সহকর্মী, সিনিয়ার, জুনিয়ার, কতজনের মৃত্যু সংবাদই না দেখেন!

দেখে প্রথমেই মনে হয় যাক, আমি তো বেঁচে আছি।

যেমন নিয়মে থাকি। একশো পার করে দেব!

আজ মনে হচ্ছে সত্তর বছর অনেক বয়স। এর ভার টানা কঠিন।

চোখটা আটকে গেল।

পার্সোনাল কলামে তাঁকে শুভ জন্মদিন বার্তা জানিয়েছে হেমকায়া, রণো, দূর্বা, প্রদীপ, মধুলা।

এটাও এই প্রথম।

হিমাদ্রি কেমন করে এত শুভেচ্ছা নেবেন? তিনি তো কিছুই দেননি এদের।

হেমকায়া, ফিরে এসো।

ইজিচেয়ারে বসে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হিমাদ্রি। পাতলা ঘুম। ক্লান্ত লাগছিল। আবার মনও উৎকণ্ঠ।

দূর্বা আর রণোর কথা শুনতে পাচ্ছিলেন।

—ফুলগুলো পরে সাজাব দাদা। তুই শুধু মালাটা মায়ের ছবিতে পরিয়ে দে।

—হেম মা কি কিছু ভোলে না?

—ভুলতে তো দেখিনি কখনও। দাদা, মাকে তো আমার কিছু মনে নেই। তোর মনে পড়ে?

—আবছা।

—এত সুন্দর ছিল?

—লতু মাসি বলে আরও অনেক সুন্দর ছিল।

—আমার তো জ্ঞান থেকেই হেম মা।

—আমিই কি হেম মা ছাড়া আর কিছু জানি?

—কী ভাবে আগলে থেকেছে আমাদের। লতু মাসি তো বলে, হেম মা না থাকলে আমরা মেণ্টাল হয়ে যেতাম।

—কত না সহ্য করেছে হেম মা!

—দাদা! তুই বিয়ে করবি না?

—এখনও জানি না। ভয় করে।

—সবাই কি মোমো হবে?

—নিজে বিয়ে করে, সকলকে বিয়ে দিতে চাস।

—সত্যি কথা। আমি এত সুখী হয়েছি····

—তুই তো অন্যরকম। আমি যে ভীষণ ঘরোয়া।

—ঠিক উতরে যাবে।

—শ্রীজয়কে দেখতে ইচ্ছে করে, আবার বুঝি, ও ওখানেই খাপ

খেয়ে গেছে।

—দেখা একদিন হবেই।

—কী জানি!

—হেম মা গেল কোথায়?

—এলেই জানা যাবে।

—চল্ খেয়ে নেয়া যাক।

—হ্যাঁ, বাবাকে ডাকি।

—বাবারই সবচেয়ে মুশকিল। এক হেম মা ছাড়া কারো সঙ্গে কথাও বলেনি কখনও।

রণো একটু হেসে বলল? হেম মার সঙ্গেও কথা বলত না কি? হেম মা কথা বলিয়ে ছেড়েছিল। বাবা তো....কম অপমান করতে চেষ্টা করেনি হেম মাকে। পারেইনি। আমার মা....খুব নরম ছিল....শুনেওছি, মনেও আছে।

—যাক গে দাদা। বাবাকে ডাকি।

হিমাদ্রি ওদের কথা শুনেছিলেন। দূর্বা ডাকতে বললেন, নিয়ে নাও, আমি আসছি।

দূর্বা বলল, মাসি, আমরা বসলে পোস্তর বড়া ভাজবে, কেমন?

—জানি গো জানি।

ধপধপে সাদা গোবিন্দভোগ চালের ভাত, সোনালি মুগের ডাল, পোস্ত বড়া, মোচাঘণ্ট, তেল কই, জলপাইয়ের চাটনি,—হিমাদ্রি বললেন, হেমের মতোই রাঁধতে শিখেছ।

—ভাল লাগছে?

—সুন্দর হয়েছে।

দূর্বা বলল, ভাল করে খাও। ওপরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। একতলায় আমাদের অনেক কাজ।

—ঘুমোব? দুপুরে তো....

—সুপ্রতীপের লেখার ভুল শোধরাও, জানি। আজ তো

সুপ্রতীপ আসেনি।

—তাই তো! কিছুই খেয়াল হয়নি।

—না আসুক। শোও, ঘুম আসবে।

—দুর্বা! মাছটা তো একেবারে....

—হেম মা আমাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে রান্না শিখিয়েছে। তোমার প্রিয় তেল কই, ছোট্ট পোনা বেগুন বড়ি কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল.... দাদার প্রিয় কষা মাংস....পালং শাকের ঘণ্ট....সুজির পায়েস....সত্যি দাদা। তোর খাবার ব্যাপারে জগাখিচুড়ি টেস্ট। প্রদীপের তো ওটুকুও নেই। কী খায় তা মনেই থাকে না।

—কখন শেখাল?

—বাঃ, ছুটির সময়ে? দাদা ইস্ত্রি শিখতে গিয়ে কম পুড়িয়েছে নিজের জামা?

—আমি....কিছু....জানতাম না....

হিমাদ্রির গলা ভেঙে গেল। লজ্জা, লজ্জা, দুস্তর লজ্জা! এক বাড়িতে থাকলেন, তাঁরই স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে! তিনি তিনজনের বিষয়ে এসব ছোট ছোট ঘরোয়া কথা জানতেনই না।

নৈঃশব্দ্য। নৈঃশব্দ্য।

—হেম চলে গেল....সুপ্রতীপও এল না আজ....আমি, আমি কিছুই বুঝিনি....আমি শুধু নিজেকে নিয়ে....আবার নৈঃশব্দ্য।

—মিলু তো চলেই গেল....নাটকুও যদি চলে যায়?

রণো তো চলে যাবে....

আবার নৈঃশব্দ্য।

রণো নরম গলায় বলল, চলো, ওপরে চলো। সব ঠিক হয়ে যাবে। হেম মা না এলে আমি যাব কী করে? আমাকে চাবি দিয়ে গেছে বাড়ির।

দুর্বা চোখ নিচু রেখেই বলল, বাবাকে নিয়ে যা দাদা। আমি মাসি, নাটকু, ওদের খেতে দেব।

রণো বাবার পিঠে হাত রাখল।

—ওঠো বাবা।

—উঠি।

ঘরে শুয়ে পড়লেই কি ঘুম আসে?

রণো জন্মায় পাঁচই মে, ১৯৬২।

দুর্বা জন্মায় ষোলই আগস্ট, ১৯৬৭।

হেমকায়া জন্মান ১৯৩৭ সালে। তারিখটা কোনদিন জানতে চাননি হিমাদ্রি।

হেমকায়ার গলা মনে আসে। ক্লান্ত, ভদ্র, সংযত কণ্ঠস্বর।

—তারিখ দিয়ে কী হবে? এ বাড়িতে একজনেরই জন্মদিন হয়। একটা তারিখই মনে রাখার মতো। আমার কথা তো জানোই। ছোটবেলা থেকে শুধুই মনে হয়েছে, আমি না জন্মালেও চলত।

—ডাক্তার বসুরা তো তোমায় অনাদর করেননি।

—বেশি আদর করেছেন। কিন্তু আড়াল তো আমার নিজের মধ্যেই ছিল।

একদিন হিমাদ্রি কী কারণে ভীষণই চেঁচামেচি করেছিলেন।

হেমকায়া কিছুই বলেননি।

রাতে হিমাদ্রি বললেন. রণো কী বলছিল, শুনি?

হেমকায়া ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, বলছিল, তোমার দুঃখ লেগেছে হেম মা? আমি বললাম, না রে রণো।

তারপর বলেছিলেন, তোমার কোনও ব্যবহারেই আমার মনে লাগে না। কেন না পরস্পর ভদ্র আচরণ করব এ কথা তো শর্তে ছিল না। তবে বলছি, এবং এটা মনে রাখবে। রণোর বয়স সতেরো। খুব সেনসিটিভ বয়েস। ওর উপস্থিতিতে আমার ওপর চেঁচিও না।

বলে একটা বই নিয়ে হেমকায়া নিজের বেডল্যাম্পটি জ্বেলে শুয়ে

পড়েছিলেন।

সেই হিমাদ্রিরই জন্মদিন।

কত দিনের কত কথা।

—রণো বা দুর্বার জন্মদিন করলেই পারো।

—ওই তো একটু পায়েস করে দিই, নতুন জামাকাপড় দিই, আর কী করব ?

চাকরি করার পর থেকে কাজের লোকদের, রণো, দুর্বার জন্মদিনে নতুন কাপড় দেন হেম।

রণো আর দুর্বা হেম মাকে কাপড় দেয়।

হিমাদ্রি কখনও দেননি।

হিমাদ্রি হেমকায়ার জন্মদিন কবে তা জানেন না।

যে দিদিকে সাহায্য করবে বলে হেমকায়া কাজ নিল, তার কথাও জিগ্যেস করেননি কখনও।

কতভাবে অপমান করেছেন হেমকায়াকে ?

হেম! ফিরে এসো। একটা সুযোগ দাও।

॥ ১১ ॥

নিচে দুর্বা আর রণোর ঘর সাজানো হয়ে গেল এক সময়ে।

সরমা আর নাটকু গল্প করছে খাবার ঘরে।

রণো বলল, বাড়ি করেছিল বটে বাবা। এত বড় খাবার ঘর, বসার ঘর, স্টাডি, একটা বেডরুম, দুটো বাথরুম, রান্নাঘর। কাজের লোকের ঘর, সব একতলায়। দোতলায় তিনটে বেডরুম। দুটো বাথরুম, ব্যালকনি, তেতলায় ছাত....সত্যি।

—ঠিকে লোক তো বাড়ি সাফ করতে করতেই....

—কিন্তু কেন ?

—"কেন" মানে ?

—এত বড় বাড়ি কেন ?

—শস্তার দিন ছিল। পৈতৃক বাড়ি বেচে টাকা পেয়েছিল, করেছিল।

—কী হবে এ বাড়ি দিয়ে ?

—বাবাই জানে ।

—যদি কোনদিন বাবার কিছু হয়····আমি হেম মাকে নিয়ে চলে যাব।

—দাদা! মিলুর ব্যাপারটা কী ?

—কিচ্ছু জানি না। ইতু মাসির বাড়িতে সরমা দি থাকে। মিলু ওর মেয়ে····ম্যারেড····তবে হেম মা বলছিল ওর স্বামী বোধহয় আবার বিয়ে করতে চায়····সামথিং, সামথিং····দেখ, হেম মা ওকে নিয়ে এসেছে দু'মাস আগে। আর কিছু জনি না।

—দাদা, হেম মা ফিরবে তো ?

—আজ ভীষণ গম্ভীর ছিল। খুব অন্যরকম লাগছিল····বলে গেল, তোমাদের দুজনকে আজ সব করতে হবে রণো। আমি নিরুপায়।

—হেম মা যে কী করে এত বছর ···

—সে কথা বললে জবাব দেয় না।

—তবে নিজের মতো জীবন তো গড়ে নিয়েছে। স্কুলে কাজ করেছে। বন্ধু হয়েছে অনেক। লতু মাসির সঙ্গে এত বছর ধরে কত ঘনিষ্ঠ।

—কোনদিন জানতেই দিল না যে মা নেই।

—আমাকে কতজন বলে, মাকে "হেম মা" কে বলে ?

—তুই কী বলিস ?

—বলি, আমি আর দাদা বলি।

—বাবা খুব হতভাগ্য।

—আজকে তেমনই মনে হচ্ছে অবশ্য। কিন্তু ভাব্ একবার,

কী ভয়ঙ্কর লোক!

—লতু মাসি তো সে জন্যেই বলে, বাবারা উনিশ শতকে পড়ে আছে।

—দাদা! হেম মা তো একজনই হয়। আমাদের মা নাকি খুব নরম ছিল। সে কি সহ্য করে গেছে তাই ভাবি।

—মরে গেছে, বেঁচে গেছে। বাবার কোনও কথায় প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিজের মত খাটিয়ে আমাদের বড় করতে মা পারত না। হেম মা পেরেছে।

—এত, এত করল হেম মা! আমাদের জন্যে এত করল, অথচ নিজের কী হল, তা জানতে দিল না।

—নিশ্চয় তার কোনও কারণ আছে। হেম মাকে আমি কারণ ছাড়া কিছু করতে দেখিনি।

—এত শিক্ষিত মনটা! এত সিভিলাইজ্‌ড! সব সময়ে বলেছে নিজের মাকে মনে রেখো। আমার পক্ষে অবশ্য সেটা অসম্ভব। দেখিইনি। মারা গেল একলাম্‌পশিয়াতে। সাতাশ বছর আগে তার কোন চিকিৎসা ছিল না?

—নিশ্চয় ছিল!

—কিছু একটা আছে ব্যাপার। লতু মাসি মার নাম করলেই বলে, ওর কথা বোলো না।

—আমাদের কপাল ভাল। হেম মার জন্যে মা আর বাবার পরিবারকে জানতে হয়নি।

—এখন তো আমরা ওদের কাছে⋯হেম মা! তোর ডিভোর্স! আমার এক উড়েকে বিয়ে!

—মোমো আবার বিয়ে করেছে, জানিস?

—কে বলল রে?

—মেমোই জানিয়েছিল।

—কাকে?

—কোন্ এক প্যাটেলকে।

—আর শ্রীজয় ?

—মার কাছেই থাকুক। বিয়ে ভাঙলে ছেলেমেয়ে নিয়ে মা বাবা টানাটানি করলে ওদের যন্ত্রণা বেশি। আমার ওটা অসম্ভব খারাপ লাগে।

—শ্রীজয় তোকে লেখে ?

—বড়দিনে একটা কার্ড। এখনও তো ছোট।

—তুই বিয়ে করে ফেল্। হেম মা ভয়ানক দুশ্চিন্তা করে. ভয়ানক।

—পিপুকে তোর কেমন লাগে ?

—লতু মাসির ভাইঝি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় দেখলি ?

—হায়দ্রাবাদে কাজ করছে তো। একটা ইকনমিক্স জার্নালে। ওদের পাবলিশিংও আছে।

—পিপুর বয়স কত রে দাদা ?

—তোর চেয়ে একটু ছোট।

—আমার কেমন লাগে তা বলে কী হবে ? এক কলেজে পড়িওনি। কথায় বার্তায় তো····

—ইয়ং লতু মাসি।

—তার কথা ভাবছিস ?

—আমার ওকে ভাল লাগে। খুব খোলামেলা. দারুণ কাজের। ওখানে মেয়েদের অর্গানাইজেশনেও আছে। নিজের কাজেও খুব ভাল। থাকে তো আমাদের ওখানেই। কৃষ্ণার ফ্ল্যাটটা শেয়ার করে।

—দাদা, ও সব জানে তো ?

—স—ব। আর শুধু বলে, ভুলে যাও তো। জীবন আজ

থেকে শুরু করো। খুব সোজা, ধারালো মেয়ে।'

—দাদা! পিপু নিশ্চয় এখানে এসেছে।

—ধরে ফেলেছিস।

—কদ্দিনের আলাপ?

—তিন বছরের।

—তুই যা চাপা না!

—না রে, আজই মনে হচ্ছে, নিঃসঙ্গ থাকা খুব কঠিন। হেম মা চলে না গেলে····

—শাড়ি পরে?

—কক্ষনো নয়।

—রাঁধে?

—নিজে তো রেঁধেই খায়।

—তুই যে বলিস ঘরোয়া বাঙালি মেয়ে?

—ওয়ার্কিং উইমেন ঘরোয়া হয় না না কি? হেম মা, তুই···· এরকম কত!

—আর বাঙালি?

--বাঙালি তো বটেই! তবে তেলুগুও দারুণ বলছে এখন।

—ঠিক করেই এসেছিলি?

—না না। আমরা খুব বন্ধু। আমাদের একটা সার্কলও আছে। ওর বিষয়েই একটু ভরসা পাচ্ছি।

—দাদা! তুই বত্রিশ বছরের বুড়ো। সময় এখন জেট গতিতে চলে। অনেকদিন ভালবাসলাম, তারপর বিয়ে করলাম। অত সময় কোথায়? আমাকে দেখ্ না। জেট সেট রোমান্স, বিয়ে, মেয়ে।

—ওটাই আমাদের প্লাস পয়েন্ট। ভালবাসা নেই, বন্ধুত্ব আছে।

—মোমোকে তো ভালবাসতিস।

—বাসতাম। সে অন্য রণো।

—হেম মা, লতু মাসি, কি খুশি হবে!

—লোহমানব চেঁচাবেন।

—আজকের পর? কিচ্ছু করবে না।

—পিপু কিন্তু প্রায় আমার মতোই লম্বা। আমি পাঁচ-এগারো, ও পাঁচ-নয়।

—হেম মাকে দরকার, হেম মাকে।

—কোথায় গেল সেই আদ্যিকেলে ব্যাগটা নিয়ে?

—ফিরে এলেই ঝগড়া করব।

—তুই বাবার জন্যে কী এনেছিস?

—নতুন ডিকশনারি। বাবা তো ডিকশনারি পাগল।

—আমি একজোড়া হায়দ্রাবাদি চটি।

—হেম মার জন্যে?

—সেটা দেখতে পাচ্ছিস। নিজেকে এনেছি।

—পিপু কি আজ আসবে?

—আসার কোনও কারণ নেই।

—একদিন আমার ওখানে আয় ওকে নিয়ে। আশ্চর্য, লতু মাসির ভাইঝি! খুব সাঁতার কাটত, খেলত!

—ভাবিস না খুব প্ল্যান প্রোগ্রাম ছিল আমাদের। হায়দ্রাবাদে কৃষ্ণার ঘরে ক'জন খেতে গেছি⋯হঠাৎ দেখি পিপু। দুজনেই অবাক। তারপর⋯যেমন হয়⋯লতু মাসিও ফোনে বলল, একদিন। তোরা এক কমপ্লেক্‌সে আছিস শুনে খুব খুশি হয়েছি। তারপর⋯আস্তে আস্তে⋯

—তুই সুখী হলেই ভাল। আমার যা চিন্তা হয় তোর জন্যে। সে জন্যেই তো চিঠি লিখে গল্প করি।

—সুখ? সুখের কথা ভাবি না দুর্বা। ভাবি শান্তির কথা, স্বস্তির কথা। দুজনে গল্প করি, বন্ধুত্ব আছে। ও খুব যুক্তিবাদী মেয়ে। ঝগড়া হবার কোনও চান্‌স নেই।

—মনে হচ্ছে ভেবে চিন্তেই এসেছিলি।

—না দুর্বা। কিছু ভাবিনি। হেম মা চলে গেল, অনেক কিছু যেন বুঝতে পারছি এখন। তোকে আগে বলিনি, হেম মা এমন আত্মনির্ভর চিরকাল! আমরা তো হেম মার ওপরেই নির্ভর করে এসেছি চিরকাল। ইদানিং····আমাকে যেন বড্ড আঁকড়ে ধরেছে। পরশু যেমন, ব্যালকনিতে চুল শুকোতে শুকোতে হঠাৎ বলল, আমাকে সুখী করতে চাস রণো, তুই একটা মনের মতো মেয়েকে বিয়ে করলে আমি যে সবচেয়ে সুখ পাব, নিশ্চিন্ত হব, সেটা বুঝিস না?

—আমি জানি।

—বললাম, মোমোর মতো যদি হয়? হেসেই বলেছিলাম।

হেম মা বলল, রণো! একেবারে এ-ওর বিপরীত, তেমন বিয়ে হলে সে বিয়ে আঁকড়ে থেকে অসুখী জীবন আগে কাটাত মানুষ। মেয়েরা তো বাধ্যই থাকত। এখনও কাটায়। এখন স্বামীরা ছেড়ে যায়, স্ত্রীরাও ছেড়ে যায়। যা হবার সে তো হয়ে গেছে।

—জানি। আমি বললাম, হেম মা! দাদাকে কি বেশি ভালবাসো? হেম মা বলল, দুর্বা! প্রথমত মেয়েরা অনেক শক্ত হয়। তুমি আমার মতোই। টিকে থাকতে জানো। রণো যে চাপা ছেলে।

—নিজে কি করে এত বছর····

—বললে বলবে, না-পাওয়াটাই দেখলে? পেয়েছিও অনেক। বিমাতা আর দুই সন্তান। সেও সতীনের,—তেমন সম্পর্ক তো হয়নি। তুমি, আমি, রণো তো তিন বন্ধু। এটা কম প্রাপ্তি?

—দুর্বা! চারটে বাজল।

—আগে দুজনে চা খাই। তারপর সেজেগুজে নিই। বাবাকেও তৈরি হতে বলি।

—প্রদীপ কখন আসবে?

—আসবে, আসবে। ব্যস্ত কেন?

—সত্যি। ভাবিইনি প্রদীপ তোকে বিয়ে করবে।

—ও থোড়াই বিয়ে করেছে। আমি যখন ঠিক করলাম যে বিয়ে করলে ওকেই করব, তখনই তো ও ফিনিশ। আমার সঙ্গে পেরে উঠত ?

—তুই একটা যা তা !

—যথেষ্ট হয়েছে। এবার ওঠ্ দাদা।

—শাড়ি পরে তোকে বেশ····

—দূর ! হাঁটতেই পারি না। তবে প্রদীপ খুব খুশি হয় দেখলে।

—শাশুড়ি ?

—ওঁর ছেলের আইবুড়োত্ব ঘোচাতে পেরেছি বলে এতই খুশি···· আর উনি ওসব মাইণ্ড করেন না। বলেন, জিন্‌স আর কুর্তা পরলে কত ভাল দেখায় তোমাকে !

—না দুর্বা। হেম মাকে দেখিয়ে দিতে হবে, আমিও টিকে থাকতে জানি। বিয়ে করে ফেলব। আজ বাবাকে দেখে বেশি করে বুঝছি, একলা-থাকাটা বুড়ো বয়সে ভয়াবহ।

—হ্যাঁ। কিন্তু পিপুকে বলবি তো !

—বলব, বলব।

—সিধা রেজেস্ট্রি।

—নো রিসেপশান !

—ইয়েস রিসেপশান। আয়রনম্যান এবার নিজেই ব্যবস্থা করবে। ভয় পেয়েছে না ?

—চিরকাল····দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

—অতীতকে ভুলে যাও রণজয়। সামনে তাকাও নতুন শতাব্দী আসছে। আমি চা করতে গেলাম।

লতু বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হেমকায়া পাথর হয়ে বসে আছেন চেয়ারে।

—আর ভেবো না হেম। মিলু ঘুমোচ্ছে।

—উঠে পড়ে যদি?

—সেডেটিভ দিয়েছি। ওঠার কোন চান্স নেই।

—লতু! বাঁচবে তো?

—হেম! তোমার কাছে এমন দুর্বলতা আশা করিনি। স—ব বলছি তোমাকে। আগে একটু দম নিতে দাও। পিপুকে চা আনতে বলেছি। এখন আমরা চা খাব। তারপর আমরা স্নান করব। তারপর পিপুর তৈরি হায়দ্রাবাদি ওমলেট আর টোস্ট খাব। পিপুকে এ ওমলেট বানাতে শিখিয়েছে রণো।

—রণো?

—হ্যাঁ হেম। পিপু তো হায়দ্রাবাদেই কাজ করে এখন। ও আর রণো খুব বন্ধু। আমি তো ছিলাম না। তোমাদের পিপু বসিয়ে যত্ন করছিল কেন বলো তো? তুমি আমার বন্ধু, রণোর হেম মা!

পিপু চা নিয়ে ঢোকে।

লতু বলে, চিনেছিস?

—রণোর ঘরে ফোটো আছে।

পিপু সমালোচকের চোখে চায়। ছবি না কি ক'মাস আগেকার। তার চেয়ে অনেক····ভেঙে গেছেন।

লতু বলেন, হেম তো শুনবে না। ওর বিশ্রাম দরকার।

—না····আমি ভালই আছি। শুধু মিলুর জন্যে····ভাবতে পারো। ও আত্মহত্যা করবে বলে বিষ খুঁজছিল? অন্তত দশ

প্যাকেট ইঁদুরমারা বিষ জমিয়েছিল।

—কেন? কী হয়েছে?

—চা খাই লতু। সারাদিন যা গেছে···তোমার এখানে বসেই আছি। মিলু যেন পাথর। কথা বলে না, কাঁদে না, শুধু বলে, আমার কী হবে? আমি তো পিপুকে বসিয়ে বাথরুমে গেলাম।

—আমিও আজ···তিনটে বড় অপারেশান···কিন্তু হেম। আজ রণোর বাবার জন্মদিন না?

—হ্যাঁ। রণো, দূর্বা সামলাক। ওর বাবা বুঝুক।

—তিনি তো পাগল হয়ে যাবেন।

হেম ক্লান্ত স্বরে বলে, পাগলও হয় না কেউ লতু, মরেও যায় না। আমাকে দেখছ না?

—তুমি সারভাইভার। বেঁচেই আছ।

—মিলুর কী হয়েছে?

—কাল ভাল করে দেখব। আজ হেভি সেডেটিভ দিয়েছি। পিপু! ওর ঘরে গঙ্গা যেন থাকে।

—ওর কোনও ব্যবস্থা না করতে পারলে, সেটা হবে আমার পরাজয়।

ফিশফিশ করে বললেন, ও বিশ্বাস করছে ও প্রেগনান্ট।

—ক'মাস মিস করেছে?

—তিন মাস।

—ইউরিন টেস্ট?

—করাইনি। কেন না আমার বাড়িতে থেকে মিলু প্রেগনান্ট হলে কাকে দায়ী করব, জানি না। দায়ী যদি কেউ হয়, তাকে শাস্তি দেব। কিন্তু আগে তো ওকে···বড় মুখ করে এনেছিলাম।

—চলো তো স্নান করবে, আমিও করব। খাওয়ার পর সব শুনব।

—তোমার ফ্ল্যাটটা সত্যি ভাল।

—বহুদিন আছি। ভাড়াও তেমন নয়। সবচেয়ে ভাল, বাড়িঅলা আমাকে রাখতেই চান।

পিপু বলে, চাইবেন না? হাম থেকে ব্রেস্ট ক্যানসার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছ?

—যেতে দে। তিতিল কোথায়?

—সারা রাত গান শুনছে বন্ধুর বাড়িতে। তোমাকে বলেছে, ও অ্যাডওনু-এ কাজ পেয়েছে?

—বলছিল, শুনিনি।

—ওর মাথায় ঢুকেছে অ্যাড-ছবি করবে। করতে পারলে ভাল মার্কেট।

—রান্নাঘরে যা পিপু।

—আর হেম। তুমি ওই বাথরুমে ঢোকো।

স্নান করে যখন টেবিলে এলেন, পিপু ভাত, পাতলা ডাল, মাছের পাতলা ঝোল আর পটল ভাজা নিয়ে এল। বলল, রণোর খুব প্রিয় এ সব।

—আর পালং শাকের ঘণ্ট। বত্রিশ বছর বয়স, বোধহয় বত্রিশ কুইণ্টাল পালং শাক খেয়েছে।

—ওর বাবার তো নানা বাতিক।

—খুব। তুমি বোসো পিপু।

—আপনি না গেলে তো রণো ফ্রি হবে না।

—আমি মিলুর ব্যবস্থা না করে যাব না।

—খাও হেম। সব শুনব। ও বাড়ির জন্যে টেনশান হচ্ছে না তো?

—না। একটুও না। ছেলে, মেয়ে আর বাবা,—তিনজন একসঙ্গে থাকা দরকারিও।

—একটুও টেনশান হচ্ছে না?

—পরে কী হবে জানি না। এখন তো হচ্ছে না।

—পিপু। আর ভাত নিস না।

—বোকো না তো লতু! চিরকাল আমার খাওয়া কমাতে চেষ্টা করছ, চিরকাল খেয়ে যাচ্ছি। একটুও মোটা হয়েছি? আসলে মাছের ঝোল আর ভাতটা খুবই প্রিয়।

—ওখানে কী করিস?

—ওখানেও তো ভীষণ খাই। হায়দ্রাবাদি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, যতরকম রান্না বলো, খেয়ে নিই।

—খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। আমরা আধ ঘণ্টা কথা বলব।

—রাত করো না লতু। আজ খুব ধকল গেছে।

—না। রাত করব না!

লতুর খাটটি খুব বড় সড়। এ বাড়ির ঘরগুলো বড়, আসবাব পুরনো ধাঁচের বড় সড়। সবই একদা নীলামে কেনা। হেম হেলান দিয়ে বিছানায় বসলেন।

—এবার বলো হেম। ব্যাপার কী।

—বলছি। সরমাকে দিয়েই শুরু।

—সরমা তো ইতুর ওখানে কাজ করে।

—হ্যাঁ, তিনটি কর্মী। সরমা একজন ওদেরই মধ্যে। একদা বস্তিতে থাকত, সে বস্তি উচ্ছেদ হয়ে গেছে কবে। ওর স্বামীকে দেখিনি কোনদিন, ওকেই দেখেছি। ওর ছেলেমেয়েরা খোঁজখবর নেয় না। মাঝে মাঝে আমাদের স্কুলে বদলি-আয়ার কাজ করেছে। মিলু ছোট মেয়ে ওর। বেশ পড়ছিল মেয়েটা, ক্লাস সেভেনে উঠেছিল। একদিন শুনলাম ওর বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

—ওর বয়স কত হয়েছিল?

—বছর ষোল হবে। আঠার বছর না হলে মেয়ের বিয়ে দিও না, এ বলে তো লাভ নেই। মেয়ের বিয়ে পাত্র জোটাতে পারলেই

দিয়ে দেয়।

—ছেলেটি কেমন?

—শুনেছি রং মিস্ত্রির কাজ করে। মধ্যমগ্রামের কাছে সুভাষ-পল্লীতে বাড়ি। বছর পাঁচেক কিছু জানি না। তারপর থেকে থেকেই মিলু হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে। ততদিনে চেহারাও খুব খারাপ হয়েছে। শুনলাম ওখানে ঠিকে কাজ করছে।

শ্বশুরবাড়িতে পরিস্থিতি খুব খারাপ। কেননা মিলুর সন্তান হচ্ছে না।

—মারধোর। অত্যাচার?

—করলেও বলেনি। ওর স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির লোকজনের প্রধান অভিযোগ মিলুর সন্তান হচ্ছে না কেন। তাগাতাবিজ, ইত্যাদি ইত্যাদি সবই হয়েছে। যেমন হয়ে থাকে।

—দু'জনে পরীক্ষা করানো····সে শিক্ষিত লোকরাই করায় না। সন্তান না হবার দায় তো মেয়েদের।

—জানি। তবে একটা কথা বলা দরকার, মিলু যতবারই এসেছে, ওকে শুধু রাতটা কাটাতে দিয়েছে সরমা। সরমার এটা নিজের জায়গা নয়।' আর সরমা ইতুর এখানে কাজ করে পয়সা জমাচ্ছে, যাতে গোবরডাঙা না কোথায় ওর বোনের বাড়ির কাছে নিজের একটা ঘর তুলতে পারে।

—সে তো ভাল।

—ইতু পছন্দ করে না মিলুর থাকাটা। মিলুকে ভোরে চলে যেতে হয়। সরমাও ভয় পায় যে মিলু আসছে যাচ্ছে বলে ইতু বলতে পারে, "সরমা। তুমি এবার এসো।" মিলু স্কুলে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে কেঁদে কেটে চলে যায়। আমার খুব খারাপ লাগছিল ব্যাপারটা।

—মেয়েদের এ অবস্থার কথা শুনতে আর পারি না হেম। আমার কাছে কি কম অভিযোগ আসে?

—মিলু বোধহয় ওর স্বামীকে খুব মিনতি করে থাকবে যে চলো, তোমাকে পরীক্ষা করাও। এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি। খুব কলহ, মনে করি একতরফা। কেননা মিলু তো এমন মেয়ে যে কেটে ফেললেও চেঁচাবে না। ঝগড়াঝাঁটির ফলে স্বামী ওকে ঘর থেকে বের করে দেয়।

—তারপর ?

—মিলু বারান্দায় শুয়ে ছিল····ওর দেওর····, মিলু যখন খুব মিনতি করে, দেওর বলে, মিলুর স্বামী অক্ষম, অক্ষম, এবং সেই···· ছি ছি !

—মিলু কী করে ?

—হাতের কাছে কি ছিল তাই দিয়ে মেরে ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ভোরে মায়ের কাছে রওনা হয়।

—সরমা নিশ্চয় জায়গা দেয় নি ?

—না। মিলু বলে, তাহলে ও রেলে মাথা দেবে।

—আর তুমি নিয়ে এলে ?

—না এনে উপায় ?

—তারপর কী হল ?

—বোঝাতে সময় গেল। কাজ অনেক করেছি লতু। সুভাষপল্লী দৌড়েছি। নিয়ে গেছি রণোর বন্ধু সঞ্জয়কে। সঞ্জয় তো পুলিশে কাজ করে। ওর সে দেওর ছিল না। তবে স্বামী, শাশুড়ি ছিল। তারা বলে যে মিলু চলে যাবার পর ওর স্বামী না কি কোন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল !

—ও সত্যিই অক্ষম ?

—হ্যাঁ। আমি বলি, মিলু আর ফিরবে না।

—সে কতদিন হল ?

—মাস আড়াই হবে। বাড়ি থেকে বের করতে পারি না, সর্বদা ভয় পায় ওর স্বামী কিছু করবে। আমি বললাম, তোকে দিয়ে আমি

ডিভোর্স করাব। লেখাপড়া শেখ, কোনও কাজ শেখ, নিজের পায়ে দাঁড়া। ইচ্ছে হলে বিয়ে তার পরেও করতে পারবি।

—বলেনি তো, মেয়েছেলের বিয়ে একবারই হয় ?

—না।

—যথেষ্ট হিন্দি সিনেমা দেখেনি বোধহয়।

হেমকায়া এত দুঃখেও ঈষৎ হেসে বললেন, দেখেছে নিশ্চয়। কেননা শাশুড়ি বলল, ছেলে মেজাজ করুক, যা করুক, বউকে নিয়ে সিনেমা যায়।

—তাহলে দেখেছে।

—যত বোঝাই, যত বোঝাই, আমারও জেদ যে ওকে এ আবর্ত থেকে টেনে তুলবই। সরমা তো বলে দিল আমার ক্ষমতাও নেই, আমি পারবও না। যা পারো করো। আমি অক্ষম। মেয়ের পিছনে দৌড়ই, এমন সময় আমার হয় না।

—স্বাভাবিক।

—অবশ্য শনিবার মেয়ের জন্যে কালীঘাটে মাথা কুটতে যায়। কোনও একটা রূপকথা আশা করে। জানি না।

মিলুকে নিয়েই ব্যস্ত।

—মিলু কি সহজ হচ্ছিল ?

—অনেক। উকিলের কাছে যেতে রাজি হল। আমিও খুব খুশি। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখি অসম্ভব ডিপ্রেশান। কিসের যেন আতঙ্ক। কিছু বলে না, মাঝে মাঝে কাঁদে। রাতে উঠে ঘুরে বেড়ায়। এক মাস ধরে সাধাসাধি, ধমকাধমকি, তার পরে তো বললাম, পরশু আবিষ্কার করলাম ইঁদুরমারা বিষের প্যাকেট।

—ওঃ! হেম!

—একটা চড় মেরেছিলাম। তখন বলে ফেলল, মাসিক হচ্ছে না....এক মাস খুব কম....তারপর বন্ধ....এটা যে গর্ভ সঞ্চার তাতে সন্দেহ কি ? স্বামী তো অক্ষম। এখন জানা যাচ্ছে। হয়তো

দেওর····লতু ! দেওরের সঙ্গে ওর দেহ সংযোগ হয়েছিল কি না ও সিওর নয়। কিন্তু গর্ভ সম্পর্কে নিশ্চিত।

—নিজেকে পাপী ভাবছে····

—একেবারে।

—আত্মহত্যা ছাড়া····

—ওর গতি নেই, ও নিশ্চিত। আমার বাড়িতে থেকে এর কোনও সুরাহা আমি করতে পারতাম না। তাতেই কোনও মতে রাতটা সামলে রেখে তোমার এখানে ছুটে এসেছি।

—যদি গর্ভবতী হয় ?

—ও চাইলে নষ্ট করবে। প্রসব করলে আমি ওকে নিয়ে থাকব। সে তো পরের কথা। যেই দায়ী হোক, ওকে তো ফেলে দিতে পারব না।

—আজ ঘুমোই হেম। কাল দেখব। আমার কাছে এসেছ, ভাববে কেন ? কালই ভর্তি করব পাড়ার নার্সিংহোমে, আমি ওটাতেও আছি। তারপর····যা দরকার সব করব।

—ও উঠবে না তো ?

—অসম্ভব। ধমক দিয়ে দুধ পাউরুটি খাইয়েছি। কড়া সেডেটিভ দিয়েছি। গঙ্গা থাকছে ঘরে। এমন সংকট বছরে দু'তিনটি সামলাতে হয়। গঙ্গা খুব কাজের। আমার কাজের লোক তিন-জনই খুব নির্ভরযোগ্য।

—তোমার····একা লাগে না লতু ?

—অল্প বয়সেই লাগছে কিনা ভাবতে সময় পাইনি। এখন তো মোটেই পাই না। ঘুমোও দেখি।

॥ ৯৩ ॥

জন্মদিনের উৎসব মিটে গেছে অনেকক্ষণ। সবাই অবাক হয়ে দেখেছে। হিমাদ্রির ছেলে, মেয়ে আর জামাই কি সুন্দর ভাবে সকলকে আপ্যায়ন করল, কি যত্ন করে খাওয়াল সকলকে।

হেমকায়ার অনুপস্থিতি নিয়ে সকলেই মন্তব্য করেছিলেন। অমিয় আর তাঁর স্ত্রী বললেন, রণো! হেম মা-র জন্মদিনটা জেনে নাও তো? সবাই মিলে আনন্দ করব?

দূর্বা, রণো আর প্রদীপ প্রত্যেককে বলেছে, হেম মাকে তো জানেন! তাঁর এক কলীগ সত্যিই খুব অসুস্থ। এমার্জেন্সীতে ভর্তি করতে হল। সে মহিলার পরিবার এখানে থাকে না। হেম মাকেই ছুটতে হল।

অমিয়র স্ত্রী বললেন, সে আর জানি না? আমার অপারেশানের সময় কি ছুটোছুটি না করলেন!

অমিয় আরেকটু ছানার পায়েস খেয়ে বললেন, হিমাদ্রি তো উদ্যোগ নেবে না, তোমরাই আয়োজন করো। আমি প্রস্তাব করছি, হিমাদ্রির সঙ্গে সাতাশ বছর ঘর করার জন্য তোমাদের হেম মাকে আমরা সংবর্ধনা দেব। না হিমাদ্রি, মুখ বুজে এ ভাবে····

দূর্বা ঈষৎ হেসে বলল, হেম মা কিন্তু যথেষ্ট শক্ত মানুষ।

হিমাদ্রি হঠাৎ বললেন, না হলে পারত? তুমি এতটুকু, রণোর সবে পাঁচ····

অমিয়র স্ত্রী বললেন, আমি তো ওঁকে মনে মনে শতবার নমস্কার করি।

ইতু মাসি শুধু হালকা ফ্রায়েড রাইস, রাধাবল্লভী, চিকেন গোয়ানিজ, দই মাছ, জলপাইয়ের কাশ্মীরী চাটনি, পাতলা রুটি, আর

ছানার পায়েস করে আনেন নি, সগর্বে বলেছেন, সব রান্না সাফোলায়। কোন অসুবিধে হবে না।

খাবারটা বুফেই হয়েছিল।

হিমাদ্রিও এক সময়ে বলতে শুরু করলেন, কারো বিপদ দেখলে ওকে তো আটকে রাখা যায় না। ড্রাইভারের টাইফয়েডে বাড়িতেই রেখে দিল।

দূর্বার শাশুড়ি দূর্বাকে বললেন, মধুলাকে নিয়ে আমি চলে যাই। মনে হচ্ছে, তোমার থাকা উচিত।

প্রদীপ একান্তে বলল, সামথিং সিরিয়াস ?

—জানি না। হেম মা-র একটা খবর না পেলে....

—তুমি থেকে যাও। ওলড ম্যান খুব ভেঙে পড়েছেন, নইলে আমাকে জড়িয়ে ধরেন ?

—আমার মা বেচারি যদি পারত !

রণো বলল, মা'র যাবার জায়গাই ছিল না।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে ইতু মাসি বললেন, সব গুছিয়ে ফ্রিজে তুলে দাও সরমা। বাসন কোসন মাজিয়ে নিয়ে কাল ভোর ভোর চলে এসো।

দূর্বা বলল, দাদা পৌঁছে দেবে।

—এবারে দাদার একটা বিয়ে দাও মা। বেটাছেলে এমন সন্নেসী হয়ে থাকতে পারে ?

—তাই দেব। ইতু মাসি গলা নামিয়ে বললেন, বড় চাকরি করছে। অন্যত্তর থাকে বাউণ্ডুলে হয়ে যেতে কতক্ষণ ?

দূর্বা হাসি চেপে বলল, আমারও তো সেই ভয়।

—আসি মা ! ভাল থাকো। দিব্যি শাশুড়ি। দিব্যি স্বামী, মেয়েটাও কী সুন্দর হয়েছে।

এক সময়ে সবাই চলে গেল।

হিমাদ্রি বললেন, অমিয় "ভাগবদ্ গীতা" দিল কী বলে ?

—ওটা অমিয় কাকার ঠাট্টা।

—তোমার শাশুড়ি এত বড় একটা ক্রসওয়ার্ডের বই! রণো বলল, ওরা ভুল করছে বাবা। এগুলো রিটায়ার করা বুড়োদের দেয়। ওরা তো জানে না তুমি এখন বই লিখছ।

—কাউকে বলিনি। ওটা সারপ্রাইজ হবে।

—নিশ্চয়। নাটকুর সঙ্গে ওপরে চলে যাও। শুয়ে পড়ো। ক্লান্তও হয়েছ।

—লতু এল না।

—অপারেশান করে এসে ঘুমোচ্ছে।

—আর হেম····

রণো বলল, আমাকে চাবি দিয়ে গেছে। নিজের তো তিন চারটে কাপড় নিয়ে গেছে। ফিরে আসবেই। দেখো, আজ দূর্বাও থেকে গেল। সব তো তোমারই জন্যে। সেটা দেখো।

—হ্যাঁ····আমি এত প্রাপ্তি ডিজার্ভ করি না।

দূর্বা ও রণো চুপ।

সবিস্ময়ে হিমাদ্রি বললেন, এটাও হেম করে দিয়ে গেল। অথচ আমি শুধু "আমি. আমি" করতাম?

রণো বলল, হেম মা ফিরে এলে সেটা মনে রেখো বাবা। তাহলেই হবে।

—তুমি তিরস্কার করলে, ঠিকই করলে।

নৈঃশব্দ্য। কিন্তু কী বাঙময় এ নৈঃশব্দ্য। বিগত সাতাশ বছর ধরে তিলে তিলে জমে ওঠা কথার তীর এ-ওকে বিঁধছে, চলে যাচ্ছে।

—না। রণোকে আমি চড় মারতে পারি।

—না। তুমি আমার মাকে অপমান করেছ।

— না, রণো সরকারি চাকরির পরীক্ষা দেবে।

—ঝি-চাকরকে "মাসি", "দাদা" বলতে শেখাচ্ছ?

—ভদ্রতার তুমি কী জানো হেম? নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড ভুলে যেও না।

আবার নৈঃশব্দ্য।

রণো, দূর্বা ও হিমাদ্রি পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। তারপর রণো বলে, সরি। শুতে যাও বাবা।

—হ্যাঁ....যাচ্ছি....তোমরাও....রাত কোরো না....

—নাটকু! সঙ্গে যা।

হিমাদ্রি উঠে যান।

—দাদা! খাসনি তো কিছুই। এখন খাবি?

—নিজেকে....শান্ত করি....।

—বলেছিস বলে অনুতাপ হচ্ছে?

—না। একটুও না।

—তবে খাবি চল্।

দূর্বা রণোর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, হেম মা নির্ঘাৎ কাল চলে আসবে।

—বাবা জানে না, যে কোনদিন আমি হেম মাকে নিয়ে চলে যেতে পারি। নিয়ে যাইনি, বাবাকে আরেকটু সুযোগ দিয়েছি।

—দাদা, শান্ত হ'।

—এত সহ্য করেছি, এত সহ্য করেছি দূর্বা। আমার মা আমাকে নিয়ে বাগানে বসে কাঁদত, আমার এখনও মনে পড়ে।

—দাদা! শান্ত হ'। চল্ খাবি চল্। নইলে আমি ভীষণ কেঁদে ফেলব, তুই বোকা বনে যাবি।

—পিপু ঠিক তোর মতন। ওকে সব বলা যায়।

—খাবি চল্।

—তুইও চল্।

—সকালে প্রথম কাজ ইতু মাসির সব বাসন মাজানো, এ সব ব্যবস্থা করা। তবে কাল বিকেলে আমাকে ফিরতেই হবে।

—আমিও কাল অফিসে ফোন করব। হেম মা কবে ফিরবে জানি না। অফিস খ্যাচ খ্যাচ করবে।

—যদি না ফেরে?

—চলে যাবার হলে আগেই চলে যেত।

—কেন যায়নি তা জানিস তো····

—আগে আমাদের জন্যে····এখন আমার জন্যে····

—বাবার জন্যেও খানিকটা। হেম মা আসলে নির্মম হতে পারে না।

—যখন পারত, আমরা ছিলাম। এখন আমার কথা ভাবে, এত ভাবে···এত চিঠি লেখে····এবারই বলিনি। নইলে সব সময়ে বলি। তোমার চিঠিগুলো আমাকে ধরে রাখে। নইলে কবে কী করে বসতাম।

—ঠিক করিসনি।

—এবার, ঠিক করে ফেললাম দুর্বা। পিপুকে বিয়ে করছি তা জানিয়েও দেব। তাহলে অন্তত···আমার বিষয়ে····

—নিশ্চিন্ত হবে। চোখ মোছ।

—আজ রাতটা কাটবে। কাল?

॥ ১৪ ॥

"গঙ্গোত্রী নার্সিংহোম"—এর ভিতরে লতুর ঘরে বসেছিলেন হেমকায়া।

সত্যিই মিলু ঘুমিয়েছে। আর সকালে যখন ওঠে তখন ও শান্ত।

শান্ত, কিন্তু অবিকল সংকল্প।

গর্ভবতী হয়ে থাকলে বেঁচে কোন লাভ নেই। গর্ভপাত করা মহাপাপ। সন্তান জন্মালে তার পিতৃ পরিচয় থাকবে না। স্বামীর ঘরে তো ফিরবেই না। মা ক্ষমতাহীন। হেমকায়াকে বা ও বিপন্ন

করবে কেন ?

তখন লতু বলেছে, আগে তোমাকে দেখি। তারপর নয়, আত্মহত্যার ব্যবস্থা আমিই করে দেব।

—আপনি ঠাট্টা করছেন।

—তোমার দায়িত্ব আমি নেব মিলু। গঙ্গাদিদিকে তো দেখলে। ও বিধবা ছিল। তারপর কোনও লোক ওকে নষ্ট করে। আত্মহত্যা করতে যায়। হাসপাতালে ওকে পাই। আমার কাছে আনি আদালত থেকে ছাড়িয়ে।

—আদালত কেন ?

—আত্মহত্যার চেষ্টা করে লোকে নানা কারণে। বেঁচে ফিরলে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। অবশ্য এখন আর আত্মহত্যা অপরাধ নয়, তখনও সে আইন ছিল। ওকে আমি রেখেছি। ওর সে ছেলে পড়াশোনা করেছে মোটর গ্যারেজে কাজ করছে। রান্না করে যে সুমিলা, ও-ও অমনি স্বামীর তাড়ানো একটি মেয়ে। সুমিলা মেশিনে উলের জামা বোনে।

—আপনি কতজনকে পুষবেন ?

—সে আমি বুঝব। মাসে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা তো কামাই।

এ কথার পর মিলু চুপ।

এখন ওর পরীক্ষা চলছে।

হেমকায়া কাগজ পড়তে পারছেন না।

—হেম মা ! এই নাও।

—এ কী, পিপু ?

—তোমার আর লতুর জন্যে কফি এনেছি। তুমি আর রণো তো কফি খাও নিজেরা বানিয়ে।

—রণো বলেছে ?

—রণো আমাকে সব বলে।

প্রায় রণোর মতোই লম্বা, কালো, পেটানো শরীর, ছেলেদের

মতো চুলছাঁটা একটি মেয়ে। এক হাতে একটা ঢাউস ঘড়ি, পরনে জিন্‌স, ঢোলা শার্ট, চশমার পিছনে ঝকঝকে চোখ, মেকাপের বালাই নেই।

রণো ওকে সব বলে।

—আর কী বলে রণো ?

—সব বলে। ও আমার বন্ধু তো। আমি তোমায় "তুমি" বলছি, কারণ আমি কাউকে "আপনি" বলি না।

—বেশ করেছ।

—রণোকে কি বড় বড় চিঠি লেখো !

—রণোও লেখে।

—তুমিও তো রণোর বন্ধু।

—রণো আর দুর্বারও খুব ভাব।

—লতু ঢুকল।

—ওঃ পিপু! কফি দে!

লতু....মিলু ?

—বলছি।

কফি খেয়ে লতু হেলান দেয় ঘোরানো চেয়ারে। বলে, যোগ ব্যায়াম আবার ধরতে হবে। শিরদাঁড়া যা কনকন করছে! হেম, তুমিও ধরো। ভাল থাকবে।

—আমি ভালই আছি।

—সাতাশ বছরে চেহারা তেমন বুড়োয়নি।

—মিলুর খবর কী ?

—ডায়াগ্রাম এঁকে ডাক্তারি ভাষায় বলতে পারতাম। তবে সোজা বাংলায় বলি। এক নম্বর কথা, মিলু সন্তানসম্ভবা হয়নি।

—কিন্তু....

—ওভারিতে টিউমার। এমন কিছু বিরল নয়। সে জন্যই মাসে মাসে....কয়েক মাসের গ্রোথ।

—টিউমার ?

—হ্যাঁ হেম।

—তাহলে ?

—ম্যালিগনাণ্ট হোক, বা না হোক, অপারেশান করতেই হবে। সে জন্যে অনেক রকম টেস্ট দরকার। আমি খুব দেরি করতেও চাই না।

—ও জানে ?

—বলব। তোমার সঙ্গে কথা বলে নিই।

—ওকে এখানে রাখা কি····

—তুমি যা বলবে তাই হবে।

—লতু ! চিরকাল তোমার কাছেই দৌড়েছি। তুমিই ওর ভার নাও। টাকা-পয়সার জন্যে ভেবো না। এখানে চার্জ কত তাও জানি না। অপারেশনে কত লাগবে····টেস্ট····ওষুধ········যা দরকার, স—ব করো।

—সবই করব ।

—টাকা····

—বাড়ি যাই, তখন দিও। তুমি মিলুর সঙ্গে কথা বলবে চলো। তারপর পিপুর সঙ্গে বাড়ি যাও, মানে আমার বাড়ি।

মিলু চোখ চেয়ে শুয়েছিল।

—মিলু !

—মাসিমা ! আমার কি হয়েছে ?

—ডাক্তার মাসি বলবে।

—তোমার গর্ভ হয়নি মিলু। টিউমার হয়েছে, টিউমার। অপারেশন করতে হবে।

—গর্ভ নয় ?

—না, মিলু।

—অপারেশান করলে সব সেরে যাবে ?

—তাই তো মনে করি।

হেমকায়া বললেন, মিলু! তুই এখানেই ভর্তি থাকবি।

ডাক্তার মাসিই তো সব করবেন। এতে আমারও সুবিধা। তুমিও নিশ্চিন্ত হলে। আর পাগলামি করার দরকার নেই, বুঝেছ?

—আপনার যে অনেক খরচ হবে····

—হোক। সব আমি করব। শুধু মনে রাখবে, ভাল হয়ে কোন ভাল কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এটুকুই আমি দেখতে চাই। এখন····আমি যেমন বলব, তুমি তেমন চলবে।

লতু বলল, তবে তাই!

—ক্ষিদে পাচ্ছে।

—এরা খেতে দেবে।

—মাকে বলবেন না মাসিমা।

—সে আমি বুঝব।

বেরিয়ে এসে হেমকায়া বললেন, লতু! তুমি কখন ফিরবে?

—দুটোর মধ্যে এসে যাব। চলো, তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাই।

—লতু বললেন, তাহলে তুমি বাড়ি ফিরবে?

—হ্যাঁ লতু। মিলুর ব্যবস্থা না হলে ফিরতাম না। মিলুর ব্যবস্থা হল। টিউমার ম্যালিগনাণ্ট না হলে তো আরওই নিশ্চিন্ত। মিলুর বাকি জীবনের চিন্তা রয়েই গেল, এখনকার সমস্যার তো ব্যবস্থা করে দিলে।

—ঋণ শোধ করছি।

—কার? রণোর মা'র?

—নিজের বিবেকের ঋণ। সে সময়ে যদি প্রথমাকে টেনে নিয়ে আসতে পারতাম····

পিপু বলল, পারতে না। আজ তোমার যে জোর আছে, সেদিন ছিল না।

—পিপু! তুই আমাকে একটু সেণ্টিমেণ্টালও হতে দিবি না?

—না, তোমাকে বিশ্রী দেখায়।

—তোরা যাচ্ছেতাই।

—বাঃ, তুমি আমার আইডিয়াল না?

—বুঝেছি। তাহলে বাড়ি ফিরবে হেম?

—নিশ্চয়। দশ হাজার রেখে গেলাম। ব্যাংক থেকে টাকা তুলব····মিলুর যা যা লাগবে····

—ওর জামাকাপড় দু' সেট····টুথ ব্রাশ, পেস্ট, সাবান, পাউডার, দুটো নাইটি····

নাইটি কিনতে হবে।

—এ টাকা থেকেই সুমিলা এনে দেবে।

—বাড়ি একবার না গেলে রণো অত্যন্ত চিন্তা করবে। ওর জন্যে কি আমার কম চিন্তা?

—মিলুর জিনিসপত্র পেঁীছে দিই। ওকে অ্যাডমিট করা হোক। তুমি ফর্মে সই করো। কাজটা মিটিয়ে চলো আমরাও যাই।

—দুর্বাও হয়তো আটকে থাকবে।

—আর, দুর্বার বাবা?

—ওঁর কথা তো আমি ভাবি না। এগ্রিমেণ্টের বিয়ে লতু, ওঁর কথা ভাবব, এমন শর্ত তো ছিল না। শর্তের বাইরে? সে তো নিজের স্বভাব আর আচরণের কারণে উনি সব দাবিই হারিয়েছেন। ওঁর কথা ভাবছি না। রণো ওর পছন্দমতো একটি মেয়েকে বিয়ে করলে আমি সত্যিই মুক্ত হয়ে যাব। মিলুর দায়িত্ব নিয়েছি। ওর জীবনটা যাতে ব্যর্থ না হয়, সেটা দেখাও আমার নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু রণোর বাবার বিষয়ে কোনও নৈতিক কর্তব্য আছে বলে মনে করি না।

—বুঝেছি। চলো, খেয়ে নেওয়া যাক।

—লতু! আমিও যাব।

—সে কি আমি জানি না? যা। খাবার নিয়ে নে।

পিপু চলে যেতে হেমকায়া বললেন, কী চমৎকার মেয়ে। ঠিক তোমার মতো।

—যদি জানতে প্রথমার মা-ভাইরা, শাশুড়ি-স্বামী, সবাই আমাকে কী চোখে দেখত!

—জানতেও চাই না, চলো।

ওঁরা নীচেই বসেছিলেন।

দূর্বা দরজা খুলতে গেল।

হিমাদ্রির বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

লতু, হেমকায়া, আরেকটি মেয়ে।

রণো হাঁ করে তাকাল, হেম মা? পিপু তুই?

—আজ্ঞে।

—হেম মা! লতু মাসি! এসো এসো।

হিমাদ্রি নির্বাক।

দূর্বা বলল, মিলু কোথায় হেম মা?

—নার্সিংহোমে। তারপর···জন্মদিন কেমন হল?

—হেম!

হিমাদ্রির মাথা নিচু।

—আমাকে ক্ষমা করতে পারবে হেম? জানি···এ কথা বলার অধিকার আমার নেই। কিন্তু···কিন্তু···এই দু'দিনেই আমি বুঝেছি, তোমাদের তিনজনেরই আমাকে···দণ্ড দেবার অধিকার আছে।

—আগে বসি। রণো, এর মানে কী?

—বাবাই বলুক। সকলের সামনেই বলুক। এবার হেম মা!

অপমান সহ্য করে এক মিনিটও থাকবে না তুমি। আমার জন্যে সইছিলে তো? আমি তোমাকে নিয়ে চলে যাব।

—সন্তানদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে?

—হ্যাঁ।

—লতুর কাছে?

—লতু....

—ঠিক আছে, আপনি বসুন।

—হেম! চলে যেয়ো না।

—সেটা তোমার প্রত্যহের আচরণের ওপর নির্ভর করবে।

হেমকায়া গলা নিচুই রাখলেন, রণো আর দুর্বাকে তোমার মতো হতে দেব না বলে এত সহ্য করছি....ওরা তোমার মতো হয়নি। সেখানে আমার জয়। আর তারপরেও....মিলুর জন্য....মিলুর জন্য....

—কী হয়েছে মিলুর। তা যদি....

—হেম মা। মিলু কি.... ?

—মিলু ঠিক আছে তো?

লতু আঙুল তুললেন। বললেন, হেম তো তোমাদের বাঁচাবার জন্যেই....মিলু আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করছিল....ওর ধারণা ছিল ও প্রেগনাণ্ট।

—তাই তোমার কাছে গিয়েছিল, লতু মাসি?

—আর কোথায় যেত দুর্বা? যাক, আজই জানলাম ওটা প্রেগনান্সি নয়। ওভারিতে টিউমার। অপারেশান হবে টেস্টের পর।

হেমকায়া শ্রান্ত গলায় বললেন, মিলু নিশ্চয় আমার কাছে প্রায়োরিটি ছিল। কিন্তু আমি তো মিলুকে নিয়েই চলে যেতে পারি। পারি না....রণোর জন্যে....ওর কী হবে....বুকচাপা, সেনসিটিভ ছেলে....বাপের সঙ্গে কোনও....

সবাই চুপ। হিমাদ্রি মাথা নিচু করে চিন্তায় তদ্‌গত।

রণো গলা খাঁখারি দিল। তারপর বলল, হেম মা! লতু

মাসি! আমি....পিপুকে....বিয়ে করতে চাই....

পিপুর মুখ বিস্ময়ে ফাঁক হয়ে গেল। ও বলল, রণো! তুই প্রোপোজ করেছিলি? আমার তো মনে পড়ছে না।

—তুই তো জানতিস। ধর্, এখনি....প্রোপোজ করি যদি?

লতু বললেন, ভ্যানতাড়াই ভাল লাগছে না। পিপু! তুই রণোকে বিয়ে করবি?

পিপু বলল, হ্যাঁ লতু! বোকাটা বলেই না। বলেই না....সত্যি!

পিপু লতুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলল।

লতু বললেন, হিমাদ্রিবাবুর পক্ষে টু মাচ হয়ে যাচ্ছে না তো সবটা?

হিমাদ্রি রুদ্ধ গলায় বললেন, না।

হেমকায়া অবাক হয়ে হিমাদ্রির দিকে তাকালেন। রণো হেমকায়ার কাঁধে মাথা রাখল হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে।

দূর্বা বলল, হেম মা! তুমি যা বলবে, তাই হবে।

হেমকায়া বললেন, তাই হোক! তোমাদের বাবার পরীক্ষা তো সবে শুরু।

হিমাদ্রি গলা পরিষ্কার করে বললেন, দূর্বা! ওদের কিছু আপ্যায়ন করবে না?

—হ্যাঁ....নিশ্চয়। আয় দাদা!

ঘরে হিমাদ্রি আর হেমকায়া। হিমাদ্রি হাত বাড়ালেন। হেমকায়া ওঁর আঙুল সামান্য ছুঁয়ে প্রত্যহের শান্ত, নম্র গলায় বললেন, সাতাশ বছরের অবিচার ধুয়ে দেবার জন্য আরও সাতাশ বছর তো পাবে না। কী পারো, দেখো। এবার তোমার পালা। আমি যা পারতাম, সব করেছি।

—হ্যাঁ হেম! চেষ্টা করব।

—যাক ! ও ঘরে যাওয়া যাক।

ও ঘরে ঢোকার পর লতু বলল, আয়রনম্যানকে অনুতপ্ত দেখলাম, এটা আপনার জন্মদিনে আপনার তরফে আমাদের প্রতি উপহার।

রণো বলল। ভাগ্যে মিলুকে এনেছিল হেম মা ! নইলে তো মেয়েটা····

হেম বললেন, আত্মহত্যা করত। এখন বাঁচবে। অন্তত আমি সে চেষ্টাই করব।

পিপু হেমকায়ার কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল। হেমকায়া বুঝলেন, কিছুই শেষ হয় না নিঃশেষে, কিছু থাকে, কিছু শুরু হয়, নইলে তা জীবন কেন ?

সমাপ্ত